গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

জেলা তথ্য ঃ চাঁদপুর

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন
এবং
আফসানা ইয়াসমীন

জানুয়ারি, ২০০৫

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস
সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প

জেলা তথ্য :
চাঁদপুর

প্রকাশকাল :
জানুয়ারি, ২০০৫

প্রকাশনায় :
পিডিও-আইসিজেডএমপি
সায়মন সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি : ৪ এ, রোড : ২২
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২
ফোন : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪, ৯৮৯২৭৮৭
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল : pdo@iczmpbd.org
ওয়েব সাইট : www.iczmpbangladesh.org
ও
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
বাড়ি : ১০৩, রোড : ০১
বনানী, ঢাকা ১২১৩।

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস - সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ, যেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে মূল মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) মূল সংস্থা।

মুদ্রন সহযোগিতায় :

ISBN :

তথ্যের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি প্রয়াস

জেলা তথ্য : চাঁদপুর

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। একদিকে প্রকৃতির অপার সম্পদ অন্যদিকে প্রকৃতির বিরূপতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ অঞ্চলের ১৯টি জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে পিডিও-আইসিজেডএমপি প্রকল্প একটি নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করছে। কর্মকৌশলগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার প্রতিটির জন্য একটি করে তথ্য বই লেখা হয়েছে যাতে করে জেলার জনগণ স্ব-স্ব জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন এবং আফসানা ইয়াসমীন যৌথভাবে এই বইটি লিখেছেন। অন্যান্য যারা এই বই লিখতে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মহিউদ্দিন আহমদ ও ড. মোঃ লিয়াকত আলী। অক্ষর বিন্যাস ও লে- আউটে সহযোগিতা করেছেন মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া ও সাহিদা খানম।

বইটির পর্যালোচনাসহ মতামত দিয়েছেন পিডিও ও ওয়ারপো-র বিশেষজ্ঞ বৃন্দ। এ ছাড়া চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ মতামত দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ড. এম. রফিকুল ইসলাম বইটি লিখতে সার্বিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জেলাভিত্তিক। ঐতিহ্যগতভাবেই মানুষের জেলাভিত্তিক পরিচয় রয়েছে। অপরদিকে জেলাগুলোরও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রও জেলা। অন্যদিকে উপকূলীয় জীবনমানের উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত উপকূলীয় অঞ্চলের নীতিমালায় রয়েছে।

সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হল জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে জেলাভিত্তিক উদ্যোগকে কার্যকর করতে প্রয়োজন জেলার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই জেলার জনগণকে তাদের নিজ নিজ জেলার অবস্থা, অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য জেলাভিত্তিক এই বই লেখা হয়েছে। উপকূলীয় ১৯টি জেলার জন্য আলাদা আলাদা বই লেখা ও প্রচার করা হচ্ছে।

এই বইটি লেখা হয়েছে চাঁদপুর জেলার জনগণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করার জন্য। এতে রয়েছে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ণনা, ভৌত ও মানব সম্পদের বর্ণনা এবং ভবিষ্যতে এ সম্পদের অবস্থা কি হতে পারে সেই বর্ণনা।

এই বই-এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে 'সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা' এবং 'সম্ভাবনা ও সুযোগ'-এর উপর বিশদ বর্ণনা। এই বর্ণনার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে অন্যান্য অংশে। তাই জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জেনে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগ্রহ সৃষ্টি ও অবদান রাখতে এই বই জনগণ তথা উন্নয়ন অংশীদারদের সাহায্য করবে।

তা ছাড়াও 'উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ' আলোচনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক আলোচনায় এই বই সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করি।

এই বইয়ের জন্য তথ্য নেয়া হয়েছে প্রধানত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এর পরেই সবচেয়ে বেশি তথ্য এসেছে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এ ছাড়াও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিদপ্তর ও বাংলাপিডিয়া থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

সাহায্য নেয়া হয়েছে চাঁদপুরের উপর লিখিত বিভিন্ন বই থেকে -

১. বি.বি.এস., ২০০১। কৃষি শুমারী ১৯৯৬ : জেলা সিরিজ চাঁদপুর। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, মে ২০০১।

২. বি.বি.এস., ১৯৯৬। আদম শুমারী ১৯৯১ : জেলা সিরিজ চাঁদপুর। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।

৩. ওয়াজেদ, আবদুল, ২০০২। বাংলাদেশের নদীমালা। পালক পাবলিশার্স। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০২।

৪. CEGIS, 2004. Vulnerability Analysis of Major Livelihood Groups in the Coastal Zone of Bangladesh. Final Report. Centre for Environmental and Geographic Information Services. Dhaka, May 2004.

৪. Khan, I., Nurul, 1977. Bangladesh District Gajetteers Comilla. Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka, November 1977

তথ্য নেয়া হয়েছে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে চাঁদপুর জেলার উপর প্রকাশিত সংবাদ ও নিবন্ধ থেকে।

এ ছাড়াও বইটির বিশেষ পর্যালোচনা ও মূল্যবান তথ্য ও মতামত দিয়েছেন :

- জনাব মোঃ তাহেরুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর

সূচীপত্র

মুখবন্ধ
জেলা মানচিত্র

সূচনা **১-৫**
এক নজরে চাঁদপুর ২
জেলার অবস্থান ৩
উপজেলা তথ্য সারণী ৪

প্রকৃতি ও পরিবেশ **৭-১৪**
প্রাকৃতিক পরিবেশ ৭
কৃষি সম্পদ ৯
দুর্যোগ ১১
বিপদাপন্নতা ১৩

জীবন ও জীবিকা **১৫-১৯**
জনসংখ্যা ১৫
জনস্বাস্থ্য ১৫
শিক্ষা ১৬
অভিবাসন ১৭
সামাজিক উন্নয়ন ১৮
প্রধান জীবিকা দল ১৮
অর্থনৈতিক অবস্থা ১৯
দারিদ্র্য ১৯

নারীদের অবস্থান **২১-২২**

অবকাঠামো **২৩-২৭**
নৌ-পথ ২৩
রাস্তা-ঘাট ২৩
রেল-পথ ২৩
পোল্ডার ২৪
হাট-বাজার ও বন্দর ২৫
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ২৫
বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ ২৫
শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো ২৫
সেচ ও গুদাম সুবিধা ২৬
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ২৬
গবেষণা প্রতিষ্ঠন ২৬
উন্নয়ন প্রকল্প ২৭

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা **২৯-৩৩**
প্রতিবেশগত সমস্যা ২৯
কৃষি সমস্যা ৩০
আর্থ-সামাজিক সমস্যা ৩১
যোগাযোগ সমস্যা ৩৩

সম্ভাবনা ও সুযোগ **৩৫-৩৭**
কৃষি ও অর্থনীতি ৩৫
প্রাকৃতিক সম্পদ ৩৬
আর্থ-সামাজিক অবস্থা ৩৬
শিল্প ও বাণিজ্য ৩৬
যোগাযোগ ব্যাবস্থা ৩৬
পর্যটন শিল্প ৩৭

ভবিষ্যতের রূপরেখা **৩৯**

দর্শনীয় স্থান **৪১**

জেলা মানচিত্র

CHANDPUR DISTRICT
90°40'
90°50' E
23° 35' N
5 0 5 10 km
BANGLADESH
Bay of Bengal
MUNSHIGANJ
COMILLA
COMILLA
Satnal Launch Ghat
Dhanagoda R
Charatbhog R
Meghna R
Gumti R
Kachua
Matlab
23° 20'
23° 20'
Padma R
Hajiganj
Dakatia R
Shahrasti
SHARIATPUR
CHANDPUR
Meghna R
23° 10'
23° 10'
Faridganj
NOAKHALI
Haim Char
LAKSHMIPUR
23° 00'
23° 00'
BARISAL
90°40'
90°50'
91°00'
District Boundary
Upazila Boundary
District H.Q
Upazila/Thana H.Q.
Railway Station
Riverport
Launch Ghat
Regional Highway
Feeder Road
Meter Gauge Railway
Waterbody
River
N
W
E
S
সূত্র : বাংলা পিডিয়া, ২০০৩

সূচনা

পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর পাড়ে অবস্থিত উপকূলীয় জেলা চাঁদপুর। এর উত্তরে মেঘনা নদী, মুন্সিগঞ্জ ও কুমিল্লা, দক্ষিণে নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও বরিশাল, পূর্বে কুমিল্লা এবং পশ্চিমে শরিয়তপুর ও মুন্সিগঞ্জ জেলা। এটি বাংলাদেশের একটি অন্যতম নদীবন্দর। একসময় চাঁদপুর বন্দর পাট ও শস্য বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল। জেলার অন্যতম বিপজ্জনক বৈশিষ্ট্য নদীভাঙন। চাঁদপুর শহরের কাছে পদ্মা ও মেঘনা নদী মিলিত হয়েছে। যার কারণে চাঁদপুর শহর ঝুঁকির সম্মুখিন। ভাঙনের জন্য চাঁদপুর শহরের অনেক অংশই বিলীন হয়ে গিয়েছে।

চাঁদপুর জেলা প্রাক্তন বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার একটি মহকুমা। চাঁদুপর মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৮ সালে । এটি সে সময়ে ত্রিপুরা (কুমিল্লা জেলার পুরাতন নাম) জেলার অন্তর্গত ছিল। ১৯৮৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি এটি জেলায় উন্নীত হয়।

চাঁদপুরের নামকরণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ঐতিহাসিক জে.এন. সেনগুপ্তের মতানুসারে, বিক্রমপুরের জমিদার চাঁন্দ রায়-এর নাম থেকে চাঁদপুর নামের উৎপত্তি। জনমত অনুসারে, চাঁদপুর মহল সংলগ্ন করালিয়া গ্রামের দরবেশ চাঁদ ফকিরের নাম থেকেই জেলার নাম হয় চাঁদপুর। আবার কারো মতে, ময়মনসিংহ গীতিকা'র চাঁদ সওদাগর তার সপ্তডিঙ্গা মধুকর নিয়ে বাণিজ্য করতে মেঘনা বন্দরে আসতেন এবং তার নাম থেকেই এই বন্দরের নাম হয়ে যায় চাঁদপুর।

জেলার মোট আয়তন ১,৭০৪ বর্গ কি. মি., যা সমগ্র দেশের আয়তনের ১.১%। আয়তনের দিক থেকে চাঁদপুর ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪০তম স্থানে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার মধ্যে ১২তম স্থানে রয়েছে।

৮টি উপজেলা, ৬টি পৌরসভা, ৮৭টি ইউনিয়ন, ৬৩টি ওয়ার্ড, ১২৫৫টি মৌজা/মহল্লা ও ১,২৪৭টি গ্রাম নিয়ে চাঁদপুর জেলা। সদর, ফরিদগঞ্জ, হাইমচর, হাজীগঞ্জ, কচুয়া, মতলব, উত্তর মতলব ও শাহ্‌রাস্তি জেলার ৮টি উপজেলা। এর মধ্যে মতলব উপজেলা আয়তনে সবচেয়ে বড় (৪০৯ বর্গ কি. মি.) যা জেলার মোট আয়তনের ২১%। অন্যদিকে, হাইমচর জেলার সবচেয়ে ছোট উপজেলা (১৭৪ বর্গ কি.মি.) যা জেলার ১০% এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।

চাঁদপুর শহর মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। ১৫টি ওয়ার্ড ও ৫টি মহল্লার সমন্বয়ে চাঁদপুর পৌরসভা গঠিত। ১৮৯৭ সালে চাঁদপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিভিত্তিক সীমা নির্ধারণের জন্য তিনটি সূচক বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে জোয়ার-ভাটার প্রভাব, লোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং ঘূর্ণিঝড়/ জলোচ্ছ্বাস। এর ভিত্তিতে চাঁদুপর জেলা অন্তর্বর্তী উপকূলীয় (Interior Coast) এলাকায় পড়েছে। এই জেলা সড়ক, নৌ ও রেলপথে সারা দেশের সাথে সংযুক্ত।

উপজেলা	৮
পৌরসভা	৬
ইউনিয়ন	৮৭
ওয়ার্ড	৬৩
মৌজা/মহল্লা	১,২৫৫
গ্রাম	১,২৪৭

এক নজরে চাঁদপুর

	বিষয়	একক	চাঁদপুর	উপকূলীয় অঞ্চল	বাংলাদেশ	তথ্য সূত্র ও বছর
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	১,৭০৪	৪৭,২০১	১৪৭,৫৭০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	উপজেলা	সংখ্যা	৮	১৪৭	৫০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	৮৭	১৩৫১	৪৪৮৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পৌরসভা	সংখ্যা	৬	৭০	২২৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	৬৩	৭৪৩	২৪০৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	১,২৯৯	১৪৬৩৬	৬৭০৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গ্রাম	সংখ্যা	১,৩২৯	১৭৬১৮	৮৭৯২৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	২২.৪১	৩৫০.৭৮	১২৩৮.৫১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	১১.১২	১৭৯.৪২	৬৩৮.৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	লাখ	১১.২৮	১৭১.৩৫	৫৯৯.৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	বর্গ কি.মি.	১,৩১৫	৭৪৩	৮৩৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	৯৮.৫	১০৪.৭	১০৬.৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির আকার	গৃহ প্রতি জনসংখ্যা	৫.৩	৫.১	৪.৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	৪.২২	৬৮.৪৯	২৫৩.০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৫.০০	৩.৪৪	৩.৫০	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২৬	৪৭	৪২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৮২	৫০	৫৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২৯	৩১	৩১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	প্রাথমিক স্কুল	সংখ্যা / ১০,০০০ জন	৬	৭	৬	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	রাস্তার ঘনত্ব	কি.মি./বর্গ কি.মি.	০.৭৯	০.৭৬	০.৭২	বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬ ও বি.বি.এস.,২০০৩
	বাজারের ঘনত্ব	বর্গ কি.মি. / সংখ্যা	৪৭	৮০	৭০	১৯৯৬ (বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬)
অর্থনীতি	মোট আয়	কোটি টাকা	৩,১৬৩	৬৭,৮৮০	২,৩৭,০৭৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	মাথাপিছু আয়	টাকা	১২,৭৬৬	১৮,১৯৮	১৮,২৬৯	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মরত শ্রম শক্তি (১৮ বছর+)	হাজার	১,০১৫	১৭,৪১৮	৫৩,৫১৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মরত নারী (খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে)	% (১৫-৪৯ বয়সদল)	২১	২৬	২৮	২০০১ (নির্পেটি, ২০০৩)
	কৃষি শ্রমিক	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৩২	৩৩	৩৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	জেলে	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৭	১৪	৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ	হেক্টর	০.০৪	০.০৬	০.০৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	দরিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	৬০	৫২	৪৯	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
	অতি দরিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	৩২	২৪	২৩	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
শিক্ষা	প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু(%)	১০০	৯৫	৯৭	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ৭ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৫০	৫১	৪৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৫২	৫৪	৫০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৪৮	৪৭	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ১৫ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৫৪	৫৭	৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৫৮	৬১	৫৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৫০	৪৯	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
স্বাস্থ্য	গ্রামীণ পানি সরবরাহ (সক্রিয় টিউবওয়েল)	প্রতি গড় জনসংখ্যা	১১২	১১১	১১৫	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩)
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৮৭	৮৮	৯১	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৫৪	৪৬	৩৭	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা (সরকারি)	জন/শয্যা	৯,১৬৬	৪,৬৩৭	৪,২৭৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নবজাতক মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৫৪	৫১-৬৮	৪৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	<৫ বছর শিশু মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৯৯	৮০-১০৩	৯০	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	অতি অপুষ্টির হার	%	৩	৬	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	ছেলে	%	১	৪	৪	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মেয়ে	%	৪	৮	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মাতৃ মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৫	৫	৫	১৯৯৮/৯৯ (স্বাস্থসেবা অধিদপ্তর, ২০০০)
	আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণকারী নারী	%	৪০	৪১	৪৪	২০০১ (নির্পেটি, ২০০৩)

জেলার অবস্থান

জাতীয় অবস্থার তুলনায় ভাল দিক

- জেলার বার্ষিক আয় প্রবৃদ্ধির হার ৫.৭%, যা জাতীয় হার (৫.৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৫.৪%) তুলনায় বেশি।
- সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর) ৫০%, যা জাতীয় হারের (৪৫%) তুলনায় বেশি ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫১%) তুলনায় কম।
- জেলার ৫৪% গৃহে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা আছে, যা জাতীয় হারের (৩৭%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৪৬%) তুলনায় বেশি।
- জেলায় গড়ে প্রতি ৪৭ বর্গ কি. মি. এলাকাতে একটি হাট-বাজার কেন্দ্র রয়েছে, যা জাতীয় (৭০ বর্গ কি. মি. এ একটি) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮০ বর্গ কি. মি. এ একটি) তুলনায় সুবিধাজনক।
- রাস্তার ঘনত্ব ০.৭৯ কি. মি./ বর্গ কি. মি., যা জাতীয় (০.৭২% কি. মি./বর্গ কি. মি.) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (০.৭৬ কি. মি./ বর্গ কি. মি.) তুলনায় বেশি।
- জেলার মোট আয়তনের মাত্র ১.০৪% প্রত্যন্ত এলাকা বা দ্বীপাঞ্চল।
- নৌ, রেল ও সড়ক পথে সারা দেশের সাথে সংযুক্ত।
- ইলিশের দেশ হিসেবে খ্যাত।
- মাঝারি মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতা।

জাতীয় অবস্থার তুলনায় দুর্বল দিক

- জেলার মাথাপিছু আয় ১২,৭৬৬ টাকা, জাতীয় আয় (১৮,২৬৯ টাকা) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (১৮,১৯৮ টাকা) তুলনায় অনেক কম।
- ক্ষুদ্র কৃষকদের সংখ্যা ৬৬%, যা জাতীয় (৫৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৮%) তুলনায় বেশি।
- জেলার ভূমিহীনদের সংখ্যা ৫৮%, যা জাতীয় (৫৩%) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৪%) তুলনায় বেশি।
- মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে জেলার অবস্থান (বি.বি.এস, ক্রমানুসারে) সমগ্র দেশে ৬২তম স্থানে।
- জেলার মোট আয়ে শিল্পখাতের অবদান ১৭%, যা জাতীয় (২৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২২%) হারের তুলনায় কম।
- জেলায় ১৫-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে ২১% খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে কর্মরত, যা জাতীয় (২৮%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৬%) এর তুলনায় কম।
- জেলার দারিদ্র্যপীড়িত ও অতি দরিদ্র গৃহস্থালির সংখ্যা (৬০%, ৩২%), জাতীয় (৪৯%, ২৩%) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (৫২%, ২৪%) তুলনায় বেশি।
- প্রতিটি গৃহস্থ ালীর গড় জনসংখ্যা ৫.৩ জন, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় বেশি।
- জেলার মোট বিদ্যুৎ সংযোগের পরিমাণ (২৯%), যা জাতীয় (৩১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৩১%) তুলনায় কম।
- হাসপাতালে শয্যা প্রতি জনসংখ্যা ৯,১৬৬ জন, যা জাতীয় দশার (৪২৭৬) তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৪ জন, যা জাতীয় (৪৩ জন) হারের তুলনায় অনেক বেশি এবং সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের বিবেচনায় প্রায় সমান (৫১-৬৮ জন)।
- জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৪০%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় বেশি।
- জেলায় শহুরে জনসংখ্যা ১৪%, যা জাতীয় (২৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৩%) তুলনায় অনেক কম।
- দেশের সর্বাধিক আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা।
- সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের সর্বাধিক জনঘনত্বের জেলা ।
- নিম্ন মাত্রার পর্যটন আকর্ষণ।
- কোন খনিজ ও তৈল ক্ষেত্র নেই।

উপজেলা তথ্য সারণী

বিষয়		একক	চাঁদপুর	উপজেলা			
				সদর	ফরিদগঞ্জ	হাইমচর	হাজীগঞ্জ
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	১,৭০৪	৩০৯	২৩২	১৭৪	১৯০
	ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	সংখ্যা	১৫০	২৯	১৬	৬	২০
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	১,২৫৫	২২৩	১৭৭	২৯	১৩৮
	গ্রাম	সংখ্যা	১,২৪৭	১২১	১৭৫	৫৯	১৪৯
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	২২.৪১	৪.৩৪	৩.৭৪	১.২৩	২.৯১
	পুরুষ	লাখ	১১.১২	২.২২	১.৮১	০.৬২	১.৪৩
	নারী	লাখ	১১.২৮	২.১২	১.৯৩	০.৬১	১.৪৮
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	জন/বর্গ কি.মি.	১,৩১৫	১,৪০৮	১,৬১৯	৭০৭	১,৫৩৭
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	৯৮.৫	১০৪	৯৩	১০২	৯৭
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	৪.২	০.৮২	০.৭২	০.২৪	০.৫১
	গৃহস্থালির আকার	জন/গৃহস্থালি	৫.৩	৫.২৯	৫.২০	৫.০১	৫.৬৪
	নারী প্রধান গৃহ	মোট গ্রামীণ কৃষিজীবী ঘরের%	৫.০	২.১	২.৪	২.৩	২.৭
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থর (%)	২৬	৩৬	৪২	৩২	৩৩
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থর (%)	৮২	৮৩	৮৬	৬৮	৮৬
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থর (%)	৯.৫৫	২১.০৪	৫.৯৩	৩.০৩	১০.৯৭
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১,৩২৪	২১৩	২২৬	৬৭	১৮১
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	২৫৭	৪৮	৪২	১০	৩০
	মহাবিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	৪০	৪৮	৪২	১০	৩৬
অর্থনীতি	কৃষি শ্রমিক	মোট গৃহস্থর (%)	৩২	৭	৭	১	৬
	কৃষি প্রধান পরিবার	মোট গৃহস্থর (%)	৭০	৩২	২৬	৩৮	২৩
	অকৃষি প্রধান পরিবার	মোট গৃহস্থর (%)	৩০	৬০	৭৯	৬৮	৭৫
	মোট চাষের জমি	হেক্টর	৮২,৮৩০	৯,৮৪৪	১৩,৭৮১	৪,৫৬৭	১০,৫২৭
	এক ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	১৫	১১	১২	১৬	২৯
	দো ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৬০	৬৮	৬৩	৪০	৬৫
	তিন ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	২৫	২১	২৫	৪৪	৫
	প্রতি ০.০১ হেক্টর জমির মূল্য	টাকা	১০,০০০	১২,৫০০	১২,৫০০	৫,০০০	১২,৫০০
শিক্ষা	সাক্ষরতার হার (৭ বছর+)	মোট জনসংখ্যা (%)	৫০	৫৭	৫২	৩৯	৪৬
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু (%)	১০০	১০১	১০৯	১০০	১০৮
	মেয়ে	৬-১০ বছর শিশু (%)	১০২	১০১	১১২	১০৩	১১১
স্বাস্থ্য	সক্রিয় টিউবওয়েল	সংখ্যা	১৯,৬৫৯	৩,৫২০	৩,৫৯৫	১,১৬৯	২,৫২০
	নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	%	৮১	৭৬	৭৮	৬১	৮৮
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	%	৮	১২	৬	৩	৮

উপজেলা				তথ্য সূত্র ও বছর
কচুয়া	মতলব	উ. মতলব	শাহ্‌রাস্তি	
২৩৬	১৭০	২৩৯	১৫৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২১	১৭	২৩	১৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১৯০	১২৯	১৮৮	১৮১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২৩১	৯৯	২৫২	১৬১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৩.৩১	১.৮১	২.৯৯	২.০৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১.৬৪	০.৮৯	১.৪৯	০.৯৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১.৬৬	০.৯২	১.৫০	১.০৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১,৪০৫	১,০৬৫	১,২৫৫	১,৩২১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৯৯	৯৭	৯৯	৯৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
০.৬০	০.৩৭	০.৫৮	০.৩৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৫.৫১	৪.৯০	৫.১৬	৫.৫২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২.০	৩.১	-	২.৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৩০	৪০	-	১০০	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৬৮	৮৯	-	৭৭	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৫.৩৫	৫.৭৮	-	৯.৮৬	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
১৮৬	৩০৪	-	১৪৭	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
৩৬	৬১	-	৩০	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
৬১	৬১	-	৩০	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
৬	৯	-	৪	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৩৩	২৬	-	২৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৭৫	৬৮	-	৭৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
১৪,৯৬৯	২০,৪০৬	-	৮,৭৩৩	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
-	৬	-	২০	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
-	৫৪	-	৭০	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
-	৩৯	-	১০	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
২৫,০০০	১৫,০০০	-	১২,৫০০	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
৪৫	৪৩	৪৯	৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৮৯	৯৭	-	৯৮	২০০১ (প্রা.শি.অ)
৯৪	৯৮	-	৯৯	২০০১ (প্রা.শি.অ)
২,৭৬০	৫,৭৫০	-	৩৪৫	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই, ২০০৩)
৮৫	৮৫	-	৯১	১৯৯১ (বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৯	৬	-	১২	১৯৯১ (বি.বি.এস.,১৯৯৪)

প্রকৃতি ও পরিবেশ

চারদিকে নদীবেষ্টিত চাঁদপুর জেলা। এখানে উত্তাল মেঘনার ভাঙা-গড়া চলছে অবিরাম। তাই নদীভাঙন, ডুবোচর, জলোচ্ছ্বাস, জোয়ারে বন্যা জেলার প্রকৃতি ও পরিবেশে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। অর্থাৎ, একদিকে নদীভাঙন আর অন্যদিকে নদীর অফুরন্ত মাছ চাঁদপুর জেলাকে উপকূলীয় অঞ্চলে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, জেলার কৃষি ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। কেননা, এখানকার কৃষির ধরন গড়ে উঠেছে নদী ভাঙন, ভূমি বৈচিত্র্য ও পানি-মাটির লবণাক্ততাকে কেন্দ্র করে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

নদ-নদী : ডাকাতিয়া ও ধনাগোদা জেলার প্রধান নদী। জেলার অর্থনীতিতে এই নদীগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। জেলার নদীপথের দৈর্ঘ্য ১১৮ কি.মি. ।প্রধান এই নদীগুলো আবার অসংখ্য নালা ও খালে বিভক্ত হয়ে সমস্ত জেলা জুড়ে ছড়িয়ে আছে এবং খাঁড়ি, শাখা নদী দিয়ে বঙ্গোপসাগরের সাথে যুক্ত। এই সব নদীতে সারা বছর ধরে জোয়ার-ভাটা খেলে এবং নাব্যতা থাকে।

মেঘনা : প্রমত্তা মেঘনা নদী আসামের নাগামণিপুর পাহাড়ে উৎসারিত হয়ে সিলেটের অমলসিদ সীমান্তে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর পর্যায়ক্রমে সিলেট, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া হয়ে চাঁদপুরে প্রবেশ করে বরিশাল, ভোলার উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। মেঘনা নদী চাঁদপুরের কাছে ১১ কি.মি. প্রশস্ত। ষাটনলের ১৬ কি.মি. ভাটিতে চাঁদপুরের কাছে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র যমুনার মিলিত স্রোত পদ্মা নামে মেঘনার সাথে মিলেছে। ডাকাতিয়া, ধনাগোদা, মতলব এবং উধামদী মেঘনার কয়েকটি শাখা নদী।

প্রধান নদী	**মেঘনা, ডাকাতিয়া, ধনাগোদা, মতলব এবং উধামদী**
নদীর দৈর্ঘ্য	**১১৮ কি.মি.**
উৎপত্তি স্থান	**মেঘনা নদী, ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী অঞ্চল**
উল্লেখযোগ্য খাল	**চাঁদপুর খাল**

মেঘনা নদী নানা শাখা নদী, উপনদী ও নালার মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের সাথে যুক্ত। এই নদীর উপর জেলার নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য সম্পদ, সেচ ব্যবস্থাপনা, বন্যার পানি নিষ্কাশন, শিল্প কল কারখানা ও পানীয় জল সরবরাহের বিষয়গুলো নির্ভর করে। মেঘনা নদী অত্যন্ত গভীর ও সারা বছর ধরে নৌ চলাচলের উপযোগী। তবে, এককালের শান্ত নদী মেঘনার রূপ আজ অনেক বদলে গেছে। নদীভাঙন, নাব্যতা হ্রাস, উজানের পানির ঢল ও সামুদ্রিক জোয়ারের ফলে উজানমুখী চাপে সৃষ্ট বন্যা ও প্লাবন মেঘনার ভয়াল রূপের বহিঃপ্রকাশ।

ডাকাতিয়া : ২০৭ কি.মি. দীর্ঘ আন্তঃসীমান্ত নদী ডাকাতিয়ার উৎপত্তি ভারতে। সেখান থেকে পাহাড়ী এই নদীটি কুমিল্লার বাগছড়া দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এই নদীটি মূলত সোনাইছড়ি, পাগলি, বোয়ালজার ও কাঁকড়ি নামের চারটি পাহাড়ী নদীর মিলিত স্রোত। নদীটি উজানে ছোট ফেনী নদী দ্বারা বিভক্ত এবং এটির প্রধান স্রোত চৌদ্দগ্রাম খাল দিয়ে আবার ফেনী নদীর সাথে যুক্ত হয়েছে। দক্ষিণে এর শাখা নোয়াখালী খাল গঠন করেছে এবং পশ্চিমে শেখেরহাট হয়ে দক্ষিণে রায়পুরের কাছে মেঘনায় মিলেছে। এই স্থানেই ডাকাতিয়ার নতুন ও তীব্র স্রোতধারা চাঁদপুর খালের মধ্য দিয়ে মেঘনায় পড়েছে। উল্লেখ্য, প্রায় সারা বছর ধরে মেঘনা নদী থেকে ডাকাতিয়ায় জোয়ার-ভাটার স্রোত প্রবাহিত হয়। সীমান্তবর্তী পার্বত্য নদী হবার জন্য সঙ্গত কারণে ডাকাতিয়া অত্যন্ত বন্যাপ্রবণ।

ধনাগোদা ও মতলব : ধনাগোদা ও মতলব মেঘনার শাখা নদী। এই দুটো নদী মেঘনা থেকে উৎপত্তি লাভ করে ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী নদীর সাথে মিলে পুনরায় মেঘনায় পড়েছে। মেঘনা নদী ও ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী নদীর পানির চাপে এই দুটো নদী অত্যন্ত বন্যাপ্রবণ।

খাল : চাঁদপুর জেলায় কয়েকটি প্রাকৃতিক ও খনন করা খাল রয়েছে। ১৮৭৮ সালে প্রায় ২,৫০০ টাকা ব্যয়ে গোমতি নদী থেকে রসুলপুর হাটের বুড়ি নদী পর্যন্ত ৫ কি.মি. দীর্ঘ চাঁদপুর খালটি খনন করা হয়।

বিল : জেলায় প্রধান কয়েকটি বিল রয়েছে। মূলত অতীতের নদী মরে গিয়ে এই বিলের সৃষ্টি। ঘোরগাওন জেলার অন্যতম একটি বিল।

পুকুর : জেলার সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা ধরনের পুকুর, যার মোট এলাকা ৬,২৫২ হেক্টর। এর মধ্যে মাছ চাষ করা হয় ৪,৫৬৩ হেক্টর পুকুরে। জেলার পরিত্যক্ত পুকুরের পরিমাণ ৪৯০ হেক্টর।

মোট পুকুরের পরিমাণ	**৬,২৫২**
মাছ চাষের পুকুর	**৪,৫৬৩**
মাছ চাষযোগ্য পুকুর	**১,১৯৯**
পরিত্যক্ত পুকুর	**৪৯০**

মাটি : জেলার মাটি সাধারণত জলপাই ধূসর এবং গাঢ়-ধূসর বর্ণের। জেলার মধ্যভাগ ও পশ্চিমাঞ্চল পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের বন্যাপ্লাবন ভূমির জলপাই ধূসর পলিমাটিযুক্ত। উত্তরাঞ্চল গাঢ়-ধূসর পলিমাটিযুক্ত, যা অত্যন্ত উর্বর। দক্ষিণ-পূর্বের মাটি খয়েরি পলিময় এঁটেল ধরনের এবং এই এলাকার মাটি ডাকাতিয়া ও ধনাগোদা নদীর পলিমাটির কারণে উর্বর। এই দুই নদী তীরের বিস্তৃত এলাকায় প্রতি বছর বন্যা দেখা দেয়। বন্যার পানি সরে গেলে উর্বর পলিমাটিতে ধান, পাট, আখ, ডাল ও তৈলবীজের চাষ হয়। বন্যা ও জোয়ারের কারণে মেঘনা নদী ক্রমাগত দিক পরিবর্তন করে চলেছে, যা জেলার মাটির ধরনে প্রভাব রাখে। শুকনো মৌসুমে জেলার কিছু অংশের মাটি লবণাক্ত হয়ে ওঠে।

মাটির ধরন	**মধ্য মেঘনা নদী প্লাবণভূমি, নিম্ন মেঘনা নদী প্লাবণ এলাকায় উচ্চ ভূমি, পুরান মেঘনা মোহনার বন্যাপ্লাবন ভূমি**
প্রধান বৈশিষ্ট্য	**জলপাই ধূসর পলিময় এবং গাঢ়-ধূসর পলিময় মাটি**

উল্লেখ্য, সমগ্র চাঁদপুর জেলা একাধারে এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোন ১৬, ১৭ ও ১৯ - এর আওতাভুক্ত। এগ্রোইকোলজিক্যাল জোন ১৬ বা মধ্য মেঘনা নদী প্লাবনভূমির মাটি উঁচু এলাকায় চুনযুক্ত এবং নিম্ন এলাকায় কাদাযুক্ত। এখানকার উপর স্তরের মাটি (Top Soil) মৃদু মাত্রায় অম্লীয় এবং উর্বরতা মাঝারি ধরনের। অন্যদিকে এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোন ১৭ বা নিম্ন মেঘনা নদী প্লাবন এলাকায় উঁচু জমির মাটি পলিময় বালুযুক্ত এবং জলাভূমিতে কাদাযুক্ত পলিমাটি দেখা যায়, যা মাঝারি ধরনের উর্বর এবং উপরের স্তরের মাটি অল্পমাত্রায় অম্লীয়। অন্যদিকে, এগ্রোইকোলজিক্যাল জোন ১৯ বা পুরান মেঘনা মোহনার বন্যাপ্লাবন এলাকার মাটি মাঝারি ধরনের উর্বর।

জলবায়ু : চাঁদপুরের জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন। এখানে নভেম্বরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত শীতকাল। শীতকালে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭° থেকে ১৩° সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠা নামা করে। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রায় বেশি পরিবর্তন অনুভূত হয় না। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩২° থেকে ২৫°সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এখানে বর্ষায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সাধারণত জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হয়। নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত হালকা ও মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। জেলায় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২,০২৬ মি. মি.। তবে, বঙ্গোপসাগরের লঘুচাপ চাঁদপুরের বৃষ্টিপাতের উপর প্রভাব ফেলে।

উদ্ভিদ-জীব বৈচিত্র্য : জেলায় কোন সংগঠিত বনায়ন হয়নি। কিন্তু, প্রায় প্রতিটি ঘরের ভিটেমাটি বিভিন্ন ধরনের গাছ-গাছালিপূর্ণ। জেলার ভিটেমাটি, বাঁধ ও পরিত্যক্ত এলাকায় প্রচুর পরিমাণে ফলজ গাছ জন্মে। কুল, বট, পিপল, অশুত্থ, নিম, বেল, রানা, পিতরাজ, জাম জারুল, তুলা, শিমূল, মান্দার, আম, তাল, কদম, গাব, জলপাই, কার্পাস, তেতুল, খেজুর, তাল, সুপারি প্রধান কয়টি গাছ। জেলায় প্রচুর পরিমাণে নারিকেল জন্মায়। কাষ্ঠল গাছের মধ্যে তেঁতুল, জারুল, কড়ই, তাল, গর্জন, ইত্যাদি প্রধান। ঋধৎস ঋড়ৎবংঃৎু ছাড়াও রাস্তার দু'ধারে নানা গাছ যেমন টিক, মেহগনি ও শিশু গাছ দেখা যায়।

উদ্ভিদ বৈচিত্র্য	**ফলজ গাছ : বেল, জাম, আম, তাল, গাব, জলপাই, তেতুল, খেজুর, তাল, সুপারি** **কাষ্ঠল গাছঃ তেতুল, জারুল, কড়ই, তাল, গর্জন** **বনজ গাছঃ কার্পাস, মান্দার, কদম, তেঁতুল, হিজল, পলাশ ও হাতিম**
প্রাণী বৈচিত্র্য	**শেয়াল, বেজি, বানর, কাঠবিড়ালি**

চাঁদপুরে কোন বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব নেই। তবে শত বছর আগে এখানে হরিণ, চিতাবাঘ, বাঘ, কুনা কুকুর এবং বুনো বিড়ালের বিচরণ ছিল বলে জানা যায়। মূলত বনাঞ্চল ও উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের অভাবের কারণে জেলার জীব বৈচিত্র্য ততটা সমৃদ্ধ নয়। তাই বর্তমানে, প্রধান প্রাণী বলতে গ্রামাঞ্চলে শেয়াল, বেজি, বানর, কাঠবিড়ালিই প্রধান। সরীসৃপের মধ্যে টিকটিকি, সাপ, কচ্ছপ এবং উভচর প্রাণীর মধ্যে ব্যাঙ, গেছো ব্যাঙ উল্লেখযোগ্য।

তবে, চাঁদপুরের জীব বৈচিত্র্যে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে জলাভূমির পাখ-পাখালী। নদী তীর, জলাভূমি, রাস্তার দু'ধারের গাছ-গাছালিতে নানা প্রজাতির পাখিরা ভিড় জমায়। এদের মধ্যে অন্যতম হল কানি বক, কালা বক, বক, দোয়েল, মাছরাঙা, হাঁস, রাজহাঁস, পিতাইল, পানকৌড়ি, ডাহুক, কোড়া ইত্যাদি।

নদী-মোহনা ও বিলের মাছ : জেলায় বিভিন্ন ধরনের উন্মুক্ত জলাশয় রয়েছে। এগুলো মাছের প্রাকৃতিক আবাসভূমি হিসেবে বিবেচিত। জেলার বেশিরভাগ মাছের সরবরাহ আসে পুকুর, জলাশয়, খাঁড়ি ও নিম্নাঞ্চল থেকে। কার্প, রুই, কাতল, মৃগেল, কালবাউস, টেংরা, মাগুর, শিং ও কই কয়টি স্বাদু পানির মাছ। জেলায় প্রচুর পরিমাণে শোল, গজার, বোয়াল, পাবদা, চিংড়ি, মলা, পুঁটি, খোকশা, বাইন ও চ্যালা মাছ পাওয়া যায়। বিদেশী জাতের মাছের মধ্যে গ্রাসকার্প, সিলভারকার্প, তেলাপিয়া, নাইলোটিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য জেলার পুকুর ও জলাশয়ে এসব মাছের বাণিজ্যিক উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে।

বনভূমি : নদীবেষ্টিত চাঁদপুর জেলায় বসতভিটার গাছ-গাছালি, সামাজিক বনায়ন ও রাস্তার দু'ধারের গাছ ছাড়াও কিছু বনের অস্তিত্ব রয়েছে। জেলার মোট বনভূমির পরিমাণ মাত্র ১ হেক্টর।

কৃষি সম্পদ

কৃষি জমি : জেলার মোট কৃষি জমির পরিমাণ ৮২,৮৩০ হে. (কৃষি অধিদপ্তর, ২০০১)। এর মধ্যে ৩৯% জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ দেয়া হয় এবং ১২% জমি সেচের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল। জেলার ফসলি জমির মোট ১৫% এক ফসলি, ৬০% দোফসলি এবং ২৫% তিন ফসলি জমি। প্রথম শ্রেণীর ০.০১ হেক্টর জমির চলতি বাজার মূল্য ১০,০০০ টাকা।

কৃষি জমি	**৮২,৮৩০ হে.**
সেচের জমি	**৫৪,৪৭৪ হে.**
শস্য নিবিড়তা	**১৯৮**

প্রধান ফসল : জেলার অর্থনীতি প্রধানত কৃষি নির্ভর। চাঁদপুরের ৭১ শতাংশ জনগণ বা গৃহস্থালি কৃষির ওপর নির্ভরশীল এবং নানা প্রজাতির দেশী ও উফসী ধান, গম, সবজি, মশলা, ডাল উৎপাদনে নিয়োজিত। ধান, পাট, সরিষা, সুপারি, গম, আলু এবং আখ প্রধান ফসল। আম, কাঁঠাল, পেঁপে, কলা, নারিকেল, তাল ও পেয়ারা প্রধান কয়টি ফল। একসময় চাঁদপুরে ডাল, তিল, কাউন, চিনা বাদাম, ধানের স্থানীয় প্রজাতির ব্যাপক চাষ করা হতো, যা আজ প্রায় বিলীন হবার পথে। ইলিশ, চিংড়ি, সুপারি ও আলু প্রধান রপ্তানি ফসল ও দ্রব্য।

প্রধান অর্থকরী ফসল	**ধান, পাট, মেস্তা, আখ, সুপারি**
প্রধান ফসল	**ধান, পাট, সরিষা, সুপারি, গম, আলু এবং আখ**
রপ্তানী ফসল ও দ্রব্য	**ইলিশ, চিংড়ি, সুপারি ও আলু**

মৎস্য সম্পদ : চাঁদপুর জেলা মাছের দিক থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ। কেননা এখানে নোনা ও মিঠা পানির মাছ দুই-ই পাওয়া যায়। ইলিশের দেশ হিসেবে খ্যাত চাঁদপুরের নদী-নালা, খাঁড়ি ও ধানক্ষেত থেকে বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে নানা প্রজাতির মাছ ধরা হয়।

২০০১-২০০২ সালে জেলায় মোট ১৯,১৬৩ মেট্রিক টন মাছ ধরা হয় এবং তা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চল (২,৫১,৯৯৯ মে. টন) এবং বাংলাদেশ (৬,৮৫,০৮০ মে. টন) এর পরিমাণের তুলনায় যথাক্রমে ৮% এবং ৩% (মৎস্য অধিদপ্তর, ২০০৩)। উল্লেখ্য নদী-মোহনায় ১০,৫০২ মে. টন ও বন্যাপ্লাবন এলাকায় ৮, ৬৬১ মে. টন মাছ ধরা হয়।

জেলার মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত কয়েক বছরে এখানে বেশ কয়টি হ্যাচারী ও মাছের খামার গড়ে উঠেছে। রেণু পোনা উৎপাদনের হ্যাচারী সংখ্যা ১১৩টি। পাশাপাশি ছোট বড় ৪,০৭৬টি মাছের খামারে দেশী-বিদেশী জাতের মাছ চাষ করা হয়। অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পর এই মাছ দেশের অন্যান্য এলাকায় সরবরাহ করা হয়। উল্লেখ্য, চাঁদপুরে জেলেদের চেয়ে মাছ চাষীদের সংখ্যা বেশি।

জলাভূমি	মে. টন
নদী-মোহনা	১০,৫০২
বন্যাপ্লাবন ভূমি	৮,৬৬১
মোট	১৯,১৬৩

পশু সম্পদ : কৃষি শুমারী ১৯৯৬ অনুসারে চাঁদপুর জেলার গ্রামীণ এলাকায় মোট ১,৩৭,৫৯৬ টি গৃহে গবাদিপশু আছে, যা মোট গ্রামীণ গৃহস্থালির ৩৮% এবং গৃহস্থালিগুলোর মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ২,৭৯,৮২৫। অর্থাৎ, প্রতিটি ঘরে গড়ে ২.৪টি করে গবাদিপশু আছে। এ ছাড়া গ্রামীণ গৃহস্থের মোট হাঁস-মুরগির সংখ্যা ২৬,৭৬,৫৫৫ এবং ঘর প্রতি গড়ে ৮টি করে হাঁস-মুরগী রয়েছে। জেলায় মোট ৯২টি পশু সম্পদ খামার এবং ৩৩১টি হাঁস-মুরগী খামার আছে (বাংলা পিডিয়া, ২০০৩) ।

মোট গবাদিপশু র সংখ্যা	**২,৭৯,৮২৫টি**
ঘর প্রতি গবাদিপশু (গড়)	**২.৪ টি**
মোট হাঁস-মুরগী র সংখ্যা	**২৬,৭৬,৫৫৫ টি**
ঘর প্রতি হাঁস-মুরগী (গড়)	**৮টি**

দুর্যোগ

চাঁদপুর জেলা প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। নদী ভাঙন, আর্সেনিক দূষণ, জলাবদ্ধতা, পানি-মাটির লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা জেলার প্রধান কয়টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ ছাড়াও মানুষের কাজকর্ম, অসচেতনতা, দারিদ্র্য ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যা বা দুর্যোগ তো রয়েছেই।

মেঘনার ভয়াবহ ভাঙন : চাঁদপুরে প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম হল নদী ভাঙন। আর এই ভাঙন চলছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। মেঘনার আঘাতে তীরবর্তী উঁচু জমি বা আইল খুব দ্রুত ধ্বংস হয়। তাই চাঁদপুর শহর রক্ষা ও বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে খোদ চাঁদপুর শহর। কেননা, প্রমত্তা মেঘনা ও পদ্মার স্রোতধারার মিলনস্থলে চাঁদপুর শহরের অবস্থান। শহরের ১৬ কি.মি. উজানে এখলাসপুরের কাছে মেঘনা নদী পদ্মা নদীর সাথে মিলিত হয়ে বিশাল স্রোতধারায় বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। চাঁদপুর শহরের যে স্থানে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী মিলিত হয়েছে, সেখানে প্রতি বর্ষা মৌসুমে স্রোতের প্রবল গতিবেগ থাকে। চাঁদপুর শহর রক্ষা বাঁধের নতুনবাজার এলাকার পশ্চিমে মেঘনা ও ডাকাতিয়ার মিলন স্থানটিকে প্রকৌশলীরা "মূলহেড" এবং স্থানীয় লোকেরা "ঠোডা" বলে। বর্ষায় শহর রক্ষা বাঁধের "মূল হেড" সংলগ্ন আড়াই হাজার মিটার এলাকা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা দুই নদীর মিলিত স্রোতে মোলহেড এলাকায় সবসময় প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়, যা ভাঙন পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে তোলে।

বন্যা : নদী ভাঙন, জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ার, ডুবোচর ও নতুন জেগে ওঠা চরের নতুন কোমল মাটি, বনায়নের অভাব, অবকাঠামোর দৈন্যদশা জেলার বন্যা প্রবণতাকে বাড়িয়ে তুলছে। সারা দেশের বন্যার পানির প্রবলস্রোত চাঁদপুর হয়ে বঙ্গোপসাগরে নামে। বন্যার তীব্রতায় মেঘনার ভাঙন ভয়াবহ রূপ নেয়, গ্রাম জনপদ তলিয়ে যায়। সাম্প্রতিক বন্যায় সদ্যসমাপ্ত তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে গেছে। ভেঙ্গে গেছে চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের রিং বাঁধ। মাত্র দেড় মাসের ব্যবধানে চর কৃষ্ণপুর, হাইমচর, চর মোলাদী, চর ভৈরবী, মুন্সীকান্দি, খলিফাকান্দি ও ষাটভাত্তর এলাকায় হাইমচরের হাজার হাজার পরিবারের বসতভিটা, আবাদি জমি, সুপারি বাগান নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে(প্রথম আলো, ২০০৪)।

আর্সেনিক দূষণ : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতি লিটার পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ মাত্রা ০.০১ মি. গ্রা.। কিন্তু, বাংলাদেশে এর পরিমাণ ০.০৫ মি. গ্রা/লি.। অথচ এই হিসাবের তুলনায় চাঁদপুর জেলায় পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ সহনীয় মাত্রার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (২০০১) - এর তথ্যানুসারে জেলায় গভীর নলকূপের

আর্সেনিক আক্রান্ত নলকূপের পরিসংখ্যান

উপজেলা	%নলকূপ (মোট)
সদর	৯৬.২০
মতলব	৮৭.০৪
ফরিদগঞ্জ	৯৮.৯৯
হাজিগঞ্জ	৯৫.৭৫
কচুয়া	৯৮.০০
শাহরাস্তি	৯৯.০২

পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা ৩৬৬ মি.গ্রা./লি: এবং জেলার প্রায় ৯০% নলকূপে আর্সেনিকের মাত্রা ৫০ মি.গ্রা./লি: -এর বেশি। জেলার মধ্যে সর্বনিম্ন ৮১% থেকে সর্বোচ্চ ৯৯% অগভীর নলকূপের পানিই মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক দূষণের শিকার। জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার লোকেরা মারাত্মক আর্সেনিক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। শুকনা মৌসুমে মানুষ আর্সেনিকযুক্ত পানি ব্যবহারে বাধ্য হচ্ছে। ৫ লাখ লোকের এই উপজেলায় আর্সেনিকমুক্ত নলকূপের সংখ্যা খুবই কম। গত ২০০২ সালে উপজেলাটির ৯৮% নলকূপ আর্সেনিক দূষণের শিকার বলে গবেষণায় প্রমাণিত হয়। ইতিমধ্যে পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশ্ব ব্যাংকের অনুদানে ৮৩টি ফিল্টার ও নলকূপ খনন করা হয়েছে।

ঢাকার কমিউনিটি হাসপাতাল ও ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যৌথ গবেষণায় চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার রাজের গাঁ ও সদর ইউনিয়নের ৫টি গ্রাম, মতলব উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের ১টি গ্রাম, সদর উপজেলার বাগাদি, মাইশান্দ ও সদর ইউনিয়নের ৭টি গ্রামের ৯০% নলকূপ আর্সেনিক আক্রান্ত বলে চিহ্নিত করেছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, জেলায় আর্সেনিকমুক্ত পানির উৎস হিসেবে ১ হাজার ২৩৯টি গভীর নলকূপ, ৭৪৯টি তারা নলকূপ ও ৩৯৫টি পিএসএফ বা Pond Sand Filter স্থাপন করা হয়েছে (প্রথম আলো, ২০০৪)। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের হিসেব অনুযায়ী এক একটি উৎস থেকে ৩০০ মানুষের পানির চাহিদা মেটানো সম্ভব। তাই, মোট ৭ হাজার ৩৯২টি পানির উৎস থাকা প্রয়োজন। ফলে, ঘাটতি থেকে যাচ্ছে ৫ হাজার ২৪৮ টির। উল্লেখ্য চাঁদপুরে আর্সেনিক প্রতিরোধে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ আর্সেনিক মিটিগেশন ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প ও ইউনিসেফ - এর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু, কোন প্রকল্পই সুফল বয়ে আনতে পারেনি। পিএসএ এর জন্য সংরক্ষিত পুকুরগুলো সংস্কার ও পরিচর্যার অভাবে মজে গেছে। এলাকাবাসীর অনেকেই মনে করেন, আর্সেনিক প্রতিরোধে নদীকেন্দ্রিক প্রকল্প সহায়ক হতে পারে। অথচ নদীবেষ্টিত চাঁদপুরে নদীকে ঘিরে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি (প্রথম আলো, ২০০৩)।

৯০% নলকূপ আর্সেনিক আক্রান্ত গ্রামের তালিকা

উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম
হাজীগঞ্জ	রাজের গাঁ, সদর	রাধুনিমুরা, মাইশামারা, মুকুন্দ দাসপুর, আহমেদপুর হাজিগঞ্জ
মতলব	সাদুল্লাপুর	মুক্তির কান্দি
সদর	বাগাদি, মাইশাদি, সদর	হাজরা, মাকিমপুর, শোবানপুর, পাক্কিদিয়া, মির্জাপুর, সিলনাদিয়া

সূত্র : ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার, ২০০১

সিইজিআইএস (২০০৩) পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, জেলার বেশিরভাগ গ্রামীণ এলাকায় অগভীর নলকূপ পেয় পানির প্রধান উৎস। অগভীর নলকূপের পানি সহজে উত্তোলন করা যায়, স্বল্প দূরত্ব ও স্বাদ ভাল বলে লোকে এর উপর বেশি নির্ভরশীল। জনসাধারণ আর্সেনিক প্রতিরোধের উপায়ের সাথে পরিচিত হতে শুরু করেছে। উল্লেখ্য, ফরিদগঞ্জ উপজেলার শাহাপুর গ্রামের কবিরাজবাড়ির পরিমল কান্তি মজুমদার প্রথম আর্সেনিক আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৯৬ সালে তার মৃত্যুর পরই এলাকাবাসী ঘাতক আর্সেনিক সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করে। যদিও জেলার বেশিরভাগ মানুষই এখনো আর্সেনিক দূষিত পানি পান করে থাকেন। অনেকে পুকুরের পানি ফুটিয়ে পান করেন।

জলোচ্ছ্বাস : ভরা বর্ষায় অর্থাৎ মে-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের ফলে সৃষ্ট প্রবল বাতাসের সাথে মেঘনার পানি ফুঁসে ওঠে। ফলে, স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে অনেক বেশি উচ্চতায় পানি ওঠে। স্বল্পস্থায়ী এই

জলোচ্ছ্বাস মেঘনা তীরবর্তী এলাকার জনপদ, ফসল, অস্থাবর সম্পত্তি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য, জলোচ্ছ্বাসের কারণে চাঁদপুরের বন্যার পানি নিষ্কাষণ বাধা প্রাপ্ত হয়।

ভরা জোয়ার : জলোচ্ছ্বাস-ভরা জোয়ার পরস্পর সম্পর্কিত। ভরা বর্ষায় সামুদ্রিক জোয়ারের প্রভাবে ও সীমান্তবর্তী নদীর পানি প্রবাহের তোড়ে ভরা জোয়ার সৃষ্টি হয়। এতে নদী তীরবর্তী এলাকাসহ জনপদ প্লাবিত হয়।

ঘূর্ণিঝড় : প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস জেলায় আঘাত হানে। মার্চের শেষ থেকে জুন-জুলাই পর্যন্ত এই জেলায় ঘূর্ণিঝড়ের আশংকা থাকে, যা জেলার সম্পদ ও জনপদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।

জলবায়ুর পরিবর্তন : জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে, আগাম বর্ষা বা অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যাসহ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি হচ্ছে।

পরিবেশ দূষণ : জলাপূর্ণ জেলা চাঁদপুর। নিম্নাঞ্চলের কারণে জেলার পরিবেশ আর্দ্র মনে হয়। এর সাথে মানুষের অসচেতনতা-অজ্ঞতা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, গৃহস্থালি বর্জ্য, জমিতে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, মাছ চাষের বর্জ্য, গৃহস্থালির বর্জ্যসহ বিভিন্ন শিল্প কল-কারখানার বর্জ্য পদার্থ জেলার সামগ্রিক পরিবেশ দূষণে প্রভাব ফেলছে।

মাছের প্রাচুর্য্য হ্রাস : নদী-নালা ও মোহনায় মাছের প্রাচুর্য্য অনেকাংশেই কমে গেছে অত্যধিক ও অনিয়ন্ত্রিত মাছ ধরার কারণে। এ ছাড়া অপরিকল্পিত নদী শাসনের ফলে নদী-নালা ও খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় মাছের আশ্রয় স্থান আজ বিলুপ্ত হবার পথে।

মাটি ও পানির লবণাক্ততা : মাটি ও পানির লবণাক্ততা চাঁদপুর জেলার একটি অন্যতম দুর্যোগ। যেহেতু মেঘনা নদী পদ্মার সাথে মিলিত হবার আগ পর্যন্ত লবণ পানি বহন করে ও বর্ষায় জোয়ার-ভাটার জোড় বেড়ে যায়। তাই চাঁদপুরের তীরবর্তী এলাকার মাটি ও পানি লবণাক্ত হয়ে ওঠে, যা স্বাভাবিক কৃষি ব্যবস্থায় পানির ব্যবহারকে অনিশ্চিত করে তোলে। এতে সেচের পানির অভাবে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। উল্লেখ্য, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, নদী ভাঙন, আর্সেনিক দূষণ, শহর রক্ষা বাঁধ ইত্যাদি কারণে জেলার নিরাপদ পানির সংকট ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করেছে। আর তাই এসব এলাকায় পুকুর অথবা বৃষ্টির পানিই প্রধান ভরসা। জেলার মাটিতে লবণের সর্বোচ্চ পরিমাণ <৪ ডিএস/এম, পানিতে লবণের পরিমাণ সর্বোচ্চ <১ ডিএস/এম।

বিপদাপন্নতা

বিপদাপন্নতা বলতে মানুষের জীবনে বিভিন্ন নেতিবাচক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এবং সেই নেতিবাচক ঘটনার সাথে মানুষের অভিযোজনের ক্ষমতাকে বুঝায়। বিপদাপন্নতার ধরণ, প্রকার ও ব্যপ্তিতে ভিন্নতা আছে। সব রকম বিপদাপন্নতা দ্বারা জেলার সব এলাকার পেশাজীবী ও সাধারণ মানুষ সমানভাবে আক্রান্ত হয় না। উপকূলীয় অঞ্চলের প্রধান জীবিকা দল ক্ষুদ্র কৃষক, জেলে, গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিকদের উপর পরিচালিত এক বিপদাপন্নতা সমীক্ষা (সিইজিআইএস, ২০০৪)-য় দেখা গেছে, চাঁদপুর জেলার সবক'টি জীবিকা দলের মধ্যে আর্সেনিক দূষণ ও নদীভাঙনের প্রভাব অপরিসীম। অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সবক'টি জীবকা দল কম বেশি বিপদাপন্ন। আর্সেনিক, নদীভাঙন, অর্থের অভাব, কৃষি উপকরণের অভাব, কাজের অভাব ইত্যাদি জেলার ক্ষুদ্র

জীবিকা দল	বিপদাপন্নতা
ক্ষুদ্র কৃষক	আর্সেনিক, নদীভাঙন, অর্থের অভাব, কৃষি উপকরণের অভাব, কাজের অভাব
জেলে	নদীভাঙন, জোয়ার, জলোচ্ছ্বাস, বাজারদর
গ্রামীণ মজুরি শ্রমিক	অর্থের অভাব, বাজারদর, ঋণ, আর্সেনিক, নদীভাঙন
শহরে মজুরি শ্রমিক	আইন-শৃংঙ্খলা পরিস্থিতি, মধ্যসত্ত্বভোগী, কাজের অভাব, নদীভাঙন

কৃষকের জীবন ও জীবিকার প্রধান দুর্যোগ। নদী ভাঙন, জলোচ্ছ্বাস, জোয়ার, বাজারদর ইত্যাদি জেলেদের জীবনের প্রধান কয়টি প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিপদাপন্নতা। তবে গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিকদের জীবনে আইন-শৃংঙ্খলা পরিস্থিতি, মধ্যসত্ত্বভোগী, কাজের অভাব, নদীভাঙন প্রধান বিপদাপন্নতা বলে চিহ্নিত হয়েছে।

জীবন ও জীবিকা

জনসংখ্যা

চাঁদপুর জেলার মোট জনসংখ্যা ২২.৪১ লাখ, যার মধ্যে ১১.১২ লাখ পুরুষ এবং ১১.২৮ লাখ নারী (বি.বি.এস., ২০০১)। মোট জনসংখ্যার ৮৬% গ্রামে বাস করে। জেলার লিঙ্গ অনুপাত ১০০: ৯৮.৫। চাঁদপুর অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ জেলা। প্রতি বর্গ কি. মি. ১,৩১৫ জন লোক বাস করে, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ৭৪৩ জন/ বর্গ কি. মি.। সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্বের বিচারে এই জেলার অবস্থান ১ম স্থানে।

শহরে জনগণ (লাখ)	**২.৫৪**
পুরুষ	**১.৩৩**
নারী	**১.২১**
গ্রামীণ জনগণ (লাখ)	**১৪.৪৮**
পুরুষ	**৭.৫১**
নারী	**৬.৯৭**
লিঙ্গ অনুপাত	**১০০: ৯৮.৫**
নির্ভরশীল জনগণের অনুপাত	**১.০৭**
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)	**১,৩১৫**
ঘনত্বের ক্রম (৬৪টি উপজেলার মধ্যে)	**৬**
নবজাতক মৃত্যুর হার	**৫৪**
<৫ মৃত্যুর হার	**৯৯**

০-১৪ ও ৬০$^{+}$ বছর বয়সী জনগণ ও ১৫-৫৯ বছর বয়সী জনগণের মধ্যে নির্ভরশীলতার অনুপাত ১.০৭, (বি.বি.এস., ২০০১)। এই জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৪ জন এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৯৯ (বি.বি.এস.- ইউনিসেফ, ২০০১)।

ঘর-গৃহস্থালি : চাঁদপুর জেলার শহরাঞ্চলে কম লোকের বসবাস লক্ষণীয়। শহুরে (.৫৭লাখ) ও গ্রামীণ (৩.৬৫ লাখ) মিলিয়ে চাঁদপুরের মোট গৃহস্থালির সংখ্যা ৪.২২ লাখ। জীবিকার ধরনের উপর গৃহস্থালির ধরন নির্ভরশীল। ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারী অনুযায়ী জেলায় মোট ৫% গ্রামীণ নারীপ্রধান গৃহস্থালি রয়েছে।

তবে সাধারণভাবে জেলার মানুষ অর্থনৈতিক দিক থেকে ততটা স্বচ্ছল নয়। গ্রামাঞ্চলে ঘরের কাঠামো দেখেই একটি পরিবারের আর্থিক অবস্থা অনুমান করা যায়। মাঠ পর্যায়ের গবেষণা (২০০২, ২০০৩) থেকে জানা যায়, এই জেলার গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণের জীবনের একটি অন্যতম সমস্যা হল ভিটে মাটির অভাব। অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে অর্থাৎ এক খণ্ড জমির উপর টিনের ছাদ সম্পন্ন দোচালা ঘর ও সাথে ছোট্ট রান্নার জায়গা নিয়েই দরিদ্র পরিবারগুলো বসবাস করে। ঘরের কাঠামোর বিবেচনায় ২৬% ঘরে পাকা দেয়াল এবং ৮২% ঘরে পাকা ছাদ আছে (বি.বি.এস., ১৯৯১)। ২০০১ সালের লোক গণনার প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী জেলায় মোট ২৯% ঘরে বিদ্যুত সংযোগ রয়েছে।

মোট গৃহস্থালির সংখ্যা	**৪.২২ লাখ**
শহুরে	**৫৭ লাখ**
গ্রামীণ	**৩.৬৫ লাখ**
গৃহ প্রতি গড় জনসংখ্যা	**৫.৩ জন**
নারী প্রধান গৃহ (মোট গৃহস্থালির)	**৫ %**

জনস্বাস্থ্য

জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চাঁদপুর জেলায় ১টি সরকারি হাসপাতাল, ৫টি বেসরকারি হাসপাতাল, ৬টি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ২০টি গ্রামীণ ডিসপেন্সারি রয়েছে (বি.বি.এস., ২০০১)। জেলা সদরের একমাত্র

সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা মাত্র ২২২। অর্থাৎ মোট ৯,১৬৬ জনের জন্য একটি হাসপাতাল (সরকারি) শয্যা রয়েছে। এ ছাড়াও জনস্বাস্থ্য সেবা প্রদানে ২০টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক, ৭৬টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ৩টি ম্যাটার্নিটি সেন্টার, ১টি চক্ষু হাসপাতাল, ১টি ডায়াবেটিক হাসপাতাল, ৬টি প্রাইভেট ক্লিনিক ও ১টি রেলওয়ে হাসপাতাল কার্যকরী রয়েছে।

জেলার জনগণের মধ্যে প্রধানত যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তা হল, সর্দি-জ্বর, ডায়রিয়া, আমাশয়, স্ক্যাবিস, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া ও পেপটিক আলসার ইত্যাদি। খাবার পানির সংকটের কারণে জেলায় প্রতি বছর ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ২০০৪ সালে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার সুবিদপুর ইউনিয়নের বাঁসারা, সোনাচৌ ও তেলিসাইর গ্রামে ডায়রিয়া পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। আতংকিত গ্রামবাসীরা বাড়িতে বাড়িতে লাল কাপড় উড়িয়ে দেয়। হাসপাতালে চিকিৎসার বাইরেও লোকজন বাড়িতে হুজুর নিয়ে দোয়া-খায়ের ও ঝাঁড়-ফুঁকের ব্যবস্থা করে।

>৫ বছরের কম শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	৯৯
১২-৫৯ মাস বয়সী শিশু অপুষ্টির হার	৩%
আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহাকারী গৃহ	৬৬%

শিশু স্বাস্থ্য : চাঁদপুরের শিশু স্বাস্থ্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণে জানা যায়, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৯৯ জন এবং ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ৩% শিশু অপুষ্টির শিকার (বি.বি.এস.- ইউনিসেফ, ২০০১)। এই পরিসংখ্যানে আরো দেখা গেছে যে, হাম, ডিপিটি ও পোলিও রোগের টিকা নিয়েছে যথাক্রমে ৮৩%, ৯০% ও ৯৮% শিশু। এ ছাড়া ৪৫% শিশু ORT নিয়েছে। ৬৬% গৃহ আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করে। চাঁদপুরের শিশুদের নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হবার প্রবণতা বেশি। বিগত ১৬ মাসে জেলার ৭টি উপজেলায় মোট ১০৩ জন শিশু নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয় (প্রথম আলো, ২০০৪)।

পানি ও পয়ঃসুবিধা : চাঁদপুরে নিরাপদ পানির তীব্র সংকট রয়েছে। নিরাপদ পানির জন্য জেলার মোট গৃহস্থালির ৮৭% কল অথবা নলকূপের পানি ব্যবহার করে। বাকী ১৩% অন্যান্য উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করে চাহিদা পূরণ করে। উল্লেখ্য, চাঁদপুর জেলার ৫২% নলকূপেই আর্সেনিকের দূষণ পরীক্ষা করা হয়নি এবং মোট জনসংখ্যার ৭৭% মানুষ আর্সেনিক বিষক্রিয়ার কথা শুনেছেন (বি.বি.এস.- ইউনিসেফ, ২০০১)। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের হিসাব অনুসারে (২০০২) চাঁদপুর জেলার গ্রামীণ এলাকায় ১১৪ জন লোকের জন্য একটি করে সক্রিয় টিউবওয়েল রয়েছে এবং প্রতি বর্গ কি. মি. -এ সক্রিয় টিউবওয়েলের সংখ্যা মোট ১২টি।জেলায় মাত্র ৫৪% ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে এবং ৩৬% ঘরে কাঁচা পায়খানা রয়েছে। এ ছাড়া ১০% ঘরে কোনরকম কাঁচা বা পাকা পায়খানার সুবিধা নেই। শহর ও গ্রামাঞ্চলের পয়:সুবিধার চিত্র এক নয়।

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাসহ গৃহ	৫৪%
অন্যান্য সুবিধাসহ গৃহ	৩৬%
পায়খানার সুবিধাবিহীন গৃহ	১০%
কল বা নলকূপের উপর নির্ভরশীল গৃহ	৮৭%

শিক্ষা

চাঁদপুর জেলার জনসাধারণের সাক্ষরতার হার উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে ৯ম স্থানে। সাত বছর বয়সের উপরের মোট জনসংখ্যার সাক্ষরতার হার প্রায় ৫০% (বি.বি.এস., ২০০১)। অন্যদিকে, প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ ১৫ বছর বয়সী ও তার উর্ধ্বের জনসাধারণের সাক্ষরতার হার ৫৪%। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জেলার শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (২০০৩) - এর তথ্য অনুযায়ী চাঁদপুর জেলায় সর্বমোট ১,৩২৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৭৮৬ টি সরকারি। এই বিদ্যালয়গুলোতে মোট ৩,৮৩,১৭২ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার ১০০%। প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার তুলনায় মোটামুটি পর্যাপ্ত। জেলায় প্রতি ১০০০০ জনগণের জন্য গড়ে ৬টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে যা জাতীয় গড় সংখ্যা (৬) - এর সমান (প্রা: শি: অ:, ২০০৩)। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষক সংখ্যা ৭,৮৫৮ জন । অর্থাৎ, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৪৯:১। এ ছাড়া বি.বি.এস., ১৯৯৮ - এর তথ্য অনুযায়ী চাঁদপুর জেলায় মোট ১১ টি কিণ্ডার গার্টেন রয়েছে।

সাক্ষরতার হার (৭^{+})	৫০%
প্রাপ্ত বয়স্কদের সাক্ষরতার হার (১৫^{+})	৫৪%
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়	২২
মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়	২৩৫
কিন্ডার গার্টেন	১১
উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ	৪০
মাদ্রাসা	১৭১
মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৩২৪
সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	৭৮৬
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	৩,৮৩,১৭২
ভর্তির হার	১০০
গড় বিদ্যালয় (প্রতি ১০ হাজার)	৬

জেলায় মোট ২২টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে, যার ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক সংখ্যা যথাক্রমে ৫,৬১১ ও ১৯৭ অর্থ্যাৎ ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ২৮:১। আবার জেলার মোট ২৩৫টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১,৫৩,৩৬২ জন। মোট শিক্ষক সংখ্যা ৪,১০৭ জন। অর্থ্যাৎ ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ৩৭:১। অন্যদিকে জেলার মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ১৭১ টি। মোট ৪৫,১৯১ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ৩,২৯৭ জন শিক্ষক এখানে কর্মরত আছেন। ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ১৪:১, যা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় ভাল। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মোট ৪০টি মহাবিদ্যালয় রয়েছে যার মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১৯,০৩৯ জন এবং ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ১৯:১। এ ছাড়াও চাঁদপুরে মোট ২৮টি ব্র্যাক স্কুল, ৩৭টি স্যাটেলাইট স্কুল, ৬১টি কম্যুনিটি স্কুল এবং ১টি সরকারি মূক ও বধির স্কুল রয়েছে।

চাঁদপুর জেলায় প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত কয়টি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সদর উপজেলায় ১৮৮৫ সালে স্থাপিত হাসান আলী সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয় (প্রাক্তন জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়), ১৮৯৯ সালে স্থাপিত বাবুরহাট উচ্চ বিদ্যালয়, শাহ আলী আলিয়া মাদ্রাসা (১৮৯৯)। এ ছাড়া, হাইমচর উপজেলার চারশোলদী কেবি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৮৩৭), নীল কমল ওসমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (১৯২৮), মতলবের বোয়ালিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৭) এবং শাহরাস্তি উপজেলার ওয়ারুক রাহমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৯৯) ও ধামরা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১০) - এর নাম উল্লেখ করা যায়।

অভিবাসন

চাঁদপুর জেলার চরাঞ্চলে অন্যান্য এলাকা বিশেষ করে নোয়াখালী, হাতিয়া, ভোলা, সন্দ্বীপ থেকে নদী ভাঙা মানুষ এসে বসতি গড়ে তুলছে। জীবিকার তাড়নায় এদের কেউ কেউ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে। বি.বি.এস., ১৯৯১ - এর সূত্রানুসারে জেলার মোট জনসংখ্যার (১.১৬ লাখ) প্রায় ৬% জনগণ চাঁদপুর জেলার বাইরে থেকে আগত।

সামাজিক উন্নয়ন

সাক্ষরতার হার (৭+ বছর)	৫০%
নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত	৮৭%
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	৫৪%
শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা	৯,১৬৬

সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর বয়সী), নিরাপদ পানি সুবিধা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও শয্যা প্রতি জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয় একটি জেলার সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নকে নির্দেশ করে। বিভিন্ন তথ্য সূত্র থেকে পাওয়া সংখ্যা ও গণনার ভিত্তিতে বলা যায়, চাঁদপুর জেলা সামগ্রিকভাবে তেমন একটা সামাজিক উন্নয়নে এগিয়ে নেই। কেননা সাক্ষরতার হার, স্বাস্থ্য সেবা - এই দুই ক্ষেত্রে জেলার অগ্রগতি হয়নি।

প্রধান জীবিকা দল

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন নদী ভাঙন, জলাবদ্ধতা, জোয়ার, মাটির উর্বরতা, জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, জমির খণ্ডায়ন আর মেঘনা মোহনার অফুরন্ত মাছ এই জেলার মানুষের জীবন ও জীবিকায় প্রভাব ফেলে। চাষের জমির ক্রম বিভাজন একটি পরিবারকে কৃষি কাজের উপর আর নির্ভরশীল করে রাখতে পারছে না। জেলেদের নিরাপত্তাহীনতা, নদী-নালা ও মোহনা আর খালে মাছ কমে যাওয়া, মাছ ধরার উপকরণের উচ্চ মূল্য আর দাদন বা মহাজনী ব্যবসার কবলে পড়ে জেলেরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা থেকে সরে আসছে। তাই আজ কৃষক থেকে কৃষি শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে মানুষ। উল্লেখ্য, জেলার প্রধান জীবিকা দলগুলো হল ক্ষুদ্র কৃষক, গ্রামীণ শ্রমিক (প্রধানত কৃষি শ্রমিক), শহুরে শ্রমিক ও জেলে।

জেলে : মেঘনা ও অন্য বড় নদী তীরবর্তী এলাকার লোকেরা সবাই কম বেশি মাছ ধরার ওপর নির্ভরশীল। জেলায় মাছের চাহিদা ব্যাপক। এখানকার জেলেরা বর্ষায় পথ-ঘাট জমি ডুবে গেলে ডোবা নালাই একমাত্র ভরসা হয়ে যায় মাছের জন্য।

মেঘনা পাড়ের দক্ষিণ গোবিন্দিয়া, মধ্য শ্রীরামদী, জাফরাবাদ গ্রামে অসংখ্য জেলে পরিবারের বসবাস। উত্তাল মেঘনার ইলিশের উপর এদের জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল। মেঘনা মোহনা ও গভীর সমুদ্রে ট্রলার অথবা নৌকা নিয়ে এরা মাছ ধরে। এদের অনেকেই বংশানুক্রমিকভাবে জেলে এবং প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বী। আবার মুসলমানদের অনেকেই মাছ ধরার পেশায় নিয়োজিত।

চাঁদপুর জেলায় মোট জেলে পরিবারের সংখ্যা ১৯,০০০, যা কৃষিজীবী পরিবারের ৭%। এখানে কোন বড় জেলে পরিবার নেই। ২,০০০টি মাঝারি জেলে পরিবার এবং ১৭,০০০ ছোট জেলে পরিবার রয়েছে (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

চাঁদপুরের জেলেদের জীবন নানা সংকটে পূর্ণ। জাটকা নিধন বিরোধী অভিযানে চাঁদপুরের সহস্রাধিক জেলে জাল ও নৌকা হারিয়েছে। তাই, মেঘনায় তারা মাছ ধরতে যেতে পারে না। বাংলাদেশ নৌবাহিনী মেঘনায় জাটকা নিধন প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তারা মেঘনায় জাটকা নিধনকারীদের সতর্ক করতে তৎপর। এ ছাড়া জলদস্যুদের আক্রমণ, মাছ ধরার ট্রলার ছিনতাই, জীবননাশ, দাদন বা মহাজনী শোষণ - এই সবই আজকালকার জেলেদের জীবনে প্রায় ঘটছে। তাই মেঘনা মোহনায় পেশাদার জেলেদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

কৃষক : জেলার মোট ক্ষুদ্র কৃষিজীবী (যাদের মোট কৃষি জমির পরিমাণ ০.০৫ - ২.৪৯ একর) পরিবারের সংখ্যা ২,৩৭,৪৪৭ টি, মধ্যম কৃষিজীবী (.৫০ - ৭.৪৯ একর) পরিবারের সংখ্যা ১৫,৮৬৮ টি এবং বড় কৃষক (৭.৫০+ একর) পরিবারের সংখ্যা মোট ৬৩৮ টি (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

কৃষি শ্রমিক : কৃষি জমি ক্রমাগত কমে যাচ্ছে এবং পরিবারের বিভাজনে মাথাপিছু জমির পরিমাণও ব্যাপকহারে কমছে। ফলে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। জেলায় মোট কৃষি শ্রমিক গৃহস্থালির সংখ্যা ১,১৬,৩৫৮ টি (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

শহুরে শ্রমিক : শহুরে শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। মূলত অব্যাহত নদী ভাঙন ও গ্রামাঞ্চলে কাজের অভাবের (সিইজিআইএস, ২০০৪) কারণে ভূমিহীন ও অন্যান্য পেশার মানুষ শহরে এসে ভিড় জমায়। জীবিকার তাগিদে এদের কেউ কেউ নৌপরিবহন শ্রমিক, যোগালী, নির্মাণ শ্রমিক, মুটে-মজুর হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ, চাঁদপুর জেলায় সামগ্রিকভাবে দিনমজুরির উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশ বাড়ছে। স্বল্প মজুরি ও মজুরি শোষণ শহুরে শ্রমিকদের বিপদাপন্ন করে তুলছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

জেলার মোট কর্মক্ষম জনশক্তি, মোট আয়, মাথাপিছু আয় এবং মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ - এই সবই সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণের প্রধান নির্দেশক। ১৯৯৯-২০০০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ১,০১৫ হাজার যার মধ্যে ৬২% পুরুষ। উল্লেখ্য, ১৯৯৫-৯৬ সালে কর্মক্ষম জনশক্তি ছিল ৯৮১ হাজার (যার মধ্যে ৫৬% পুরুষ) অর্থাৎ চাঁদপুর জেলায় কর্মক্ষম পুরুষদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে (বি.বি.এস., ২০০১)। চলতি বাজার দর অনুযায়ী জেলার বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয় ১২,৭৬৬ টাকা। চাঁদপুর জেলায় মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.০৪ হেক্টর এবং প্রায় ৩২% কৃষি শ্রমিক পরিবার (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

মাথাপিছু আয় (টাকা)	১২,৭৬৬
বিবিএস ক্রম(মাথাপিছু আয় অনুসারে)	৬২
মোট শিল্পে আয়	১৭
স্থিরদরে বার্ষিক মোট আয় বৃদ্ধি	৫.৭
বিদ্যুৎ সংযোজনসম্পন্ন খানা	২৯

দারিদ্র্য

নদী ভাঙন জেলার দারিদ্র্য দশাকে প্রভাবিত করে চলেছে। ভাঙনে জমি জমা, বসত ভিটাসহ সমস্ত অস্থাবর-স্থাবর সম্পত্তি হারিয়ে চাঁদপুরের সনাতন কৃষিজীবী পরিবার ক্রমশ ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র কৃষকে পরিণত হচ্ছে। চাঁদপুর জেলার মোট জনসংখ্যার ৬০% দরিদ্র এবং ৩২% অতি দরিদ্র (বি.বি.এস-ইউনিসেফ, ২০০১)। এ ছাড়া জেলার মোট ৫৮% লোক ভূমিহীন এবং ৬৬% ক্ষুদ্র কৃষক (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

দরিদ্র	৬০
অতি দরিদ্র	৩২
ভূমিহীন	৫৮
ক্ষুদ্র কৃষক	৬৬

নারীদের অবস্থান

অতি সম্প্রতি সিপিডি - ইউ.এন.এফ.পি.এ বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মোট জনসংখ্যা, সাক্ষরতার হার এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যার বিচারে নারী-পুরুষের অসমতার একটি ধারাক্রম নির্ধারণ করে একটি লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়ন সূচক তৈরী করেছে। এতে দেখা যায় চাঁদপুর জেলা "মাঝারি মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতা"র এলাকা। এই জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন নদীভাঙন, বন্যা, জলাবদ্ধতা), দারিদ্র্য, শিক্ষা সুবিধা ও মূল্যবোধ পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান ও ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

লিঙ্গ অনুপাত : মোট জনসংখ্যার ৫০.৩৭% নারী। লিঙ্গ অনুপাত ১০০: ৯৮.৫। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (০-১৪ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০: ১১১। আবার প্রজননক্ষম বয়স দলে (১৫-৪৯ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০: ৮৩ (বি.বি.এস., ২০০১)। অর্থাৎ প্রজনন বয়স দলে নারীদের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি।

বৈবাহিক অবস্থান : জেলার ১০ বছর ও তার ঊর্ধ্বে মোট জনসংখ্যা হল ১৫.৮৪ লাখ। এর মধ্যে ৩২% নারী বিবাহিত, ১৭% নারী অবিবাহিত এবং ০.২২% নারী স্বামী পরিত্যক্তা (বি.বি.এস., ২০০১)। এখানে বিয়ে নিবন্ধনের হার ৯৩ % (বি.বি.এস-ইউনিসেফ, ২০০১)।

প্রজনন স্বাস্থ্য : জেলার নারীদের মোট প্রজনন হার ৩.২ (বি.বি.এস.- ইউনিসেফ, ২০০১)। অর্থাৎ একজন নারী তার জীবদ্দশায় গড়ে ৩টি সন্তান জন্ম দেয়। পরিবার পরিকল্পনা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (FPMIS-১৯৯৯)-এর তথ্য অনুসারে, জেলায় মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪.৮৭, যা নানা প্রপঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত। খাদ্যের অসম বন্টন, ঝুঁকিপূর্ণ সন্তান জন্মদান, আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব যেমন, ডাক্তার, ক্লিনিক ও হাসপাতালের অভাব মায়েদের মৃত্যু হারকে প্রভাবিত করে। জেলার ১৩-৪৯ বয়স দলের মোট ৪০% নারী আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ৪১%।

- **৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (৯৯) জাতীয় হারের (৯২) তুলনায় বেশি ।**
- **কৃষিজীবী নারী প্রধান গৃহের সংখ্যা (৫%) জাতীয় সংখ্যার (৩.৫%) তুলনায় বেশি ।**
- **১৫-৪৯ বছরের লিঙ্গ অনুপাত (৮৩) জাতীয় অনুপাতের (১০০) তুলনায় কম।**
- **সাক্ষরতার হার (৫২) জাতীয় হার (৫০) এর তুলনায় বেশি**
- **তালাকপ্রাপ্তা/স্বামী পরিত্যক্তা নারীর সংখ্যা (০.২২) জাতীয় সংখ্যার (০.৩৭) তুলনায় কম।**
- **মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার (১০০) জাতীয় হারের (৯৮) তুলনায় বেশি ।**
- **জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৪০%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় বেশি।**
- **জেলায় ১৫-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে ২১% খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে কর্মরত, যা জাতীয় (২৮%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৬%) এর তুলনায় কম।**

শ্রম বিভাজন : চাঁদপুর জেলার নারী-পুরুষের কাজের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। নারীদের ঘরের মধ্যে কাজ করার প্রবণতা বেশি। তবে দরিদ্র পরিবারের নারীরা ঘরের বাইরে প্রধানত পারিবারিক উৎপাদন প্রক্রিয়া, দিনমজুরি ও পরের গৃহে শ্রম দেয়। মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কর্মক্ষম পুরুষ সদস্যের অভাব ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে দরিদ্রতম নারীরা ঘরের বাইরে নানা ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হয়। তাই বেঁচে থাকার তাগিদে তারা শহরাঞ্চলে কাজ নিতে বাধ্য হয়।

সমাজে নারীর গতি-প্রকৃতি কিছু প্রপঞ্চের উপর নির্ভরশীল। তথাকথিত পর্দা প্রথা, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় অনুশাসন ও আইন শৃংখলা পরিস্থিতি এই জেলার নারীদের গতিশীলতার প্রধান বাধা। তবে নারীদের চলাচলের প্রকৃতি অনেকাংশেই সম্পদের সূচকের উপর নির্ভরশীল (কেয়ার, ২০০৩)। রাস্তা-ঘাটের ক্রমউন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা, এনজিও-দের সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও প্রকল্প কার্যক্রম নারীদের বাইরের জগতের সাথে সম্পৃক্ত করতে সহায়তা করছে। তবে ঘরে-বাইরে সব জায়গাতেই নারীরা মজুরি শোষণের শিকার।

শ্রমশক্তি : চাঁদপুর জেলার নারীদের মধ্যে কর্মক্ষম শ্রম শক্তির হার ক্রমশ কমছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে কর্মক্ষম শক্তির অর্থাৎ ১৫ বছরের উর্ধ্বে জনগণের ৪৪% ছিল নারী। পরবর্তীতে ১৯৯৯-২০০০ সালে তা কমে হয় ৩৮% (বি.বি.এস., ২০০১)। এর মধ্যে ৩৮% গ্রামীণ নারী ও শহুরে নারী ৩৬%। অর্থাৎ, গ্রাম ও শহরে নারীরা কাজ করছে। মূলত প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে পড়েই হোক আর দারিদ্র্যের কারণেই হোক গ্রামীণ নারীরা সেই চিরায়ত অধঃস্তনতা ও পারিবারিক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। আর তাই গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের ২% নারীদের পরের জমিতে কাজ করতে দেখা যায় (বি.বি.এস., ১৯৯৬)। চাঁদপুরে কৃষিখাতে মজুরিবিহীন শ্রমদানে নিয়োজিত ১৬% কৃষিজীবী নারী। জেলার ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে মাত্র ২১% অর্থ বা খাদ্যের বিনিময়ে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ২৬%।

স্বাস্থ্য পুষ্টি : জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৪ জন । অতি অপুষ্টি, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কাঠামো ও সেবা ব্যবস্থা জেলার নারীর স্বাস্থ্য দশাকে আক্রান্ত করছে। তবে জেলার মেয়ে শিশুদের মধ্যে অতি অপুষ্টির হার ৪%, যা জাতীয় হারের (৮%) তুলনায় কম। প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অভাবে ৯৬% নারীই ঘরে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন এবং ৮৬% ক্ষেত্রে আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশীরা সন্তান জন্ম নেয়ার সময় সহায়তা করেন। মাত্র ৫% নারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের সেবা পান। তবে আধুনিক ডাক্তারদের সেবাপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা মাত্র ৯% (বি.বি.এস., - ইউনিসেফ, ২০০১)। অর্থাৎ জেলার নারীরা প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণে পিছিয়ে আছে।

শিক্ষা : চাঁদপুর জেলার নারীদের সাক্ষরতার হার সন্তোষজনক নয়। কেননা ৭^{+} বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার মাত্র ৪৮%, যা প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের সাক্ষরতার হার (৫০%) -এর তুলনায় কম (বা.প.ব্যু, ২০০১)। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েরা এগিয়ে আছে। মোট ছাত্রছাত্রীদের ৫০% মেয়ে শিশু, যাদের বয়স ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশু ভর্তির হার ১০০। একই চিত্র দেখা যায় উচ্চ ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে। স্কুলের মোট ছাত্রছাত্রীর ৫৮% ছাত্রী এবং মাদ্রাসায় মোট ছাত্রছাত্রীর ৪১% ছাত্রী (ব্যানবেইস, ২০০৩)। তবে কলেজগুলোতে ছাত্রীসংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় কম। মাত্র ৪২% ছাত্রী জেলার কলেজগুলোতে লেখাপড়া করে।

নারী নির্যাতন : চাঁদপুর জেলার ঘরের ভেতরে-বাইরে নারীরা প্রতিনিয়তই নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার। ঘরে নারী নির্যাতন জেলার একটি অতি পরিচিত ঘটনা। এ ছাড়া যৌতুক, বাল্য বিয়ে, বহু বিয়ে, নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, জোরপূর্বক বিয়ে এবং মজুরি শোষণ জেলার নারী নির্যাতনের অন্যতম কয়টি উদাহরণ। গ্রামাঞ্চলে বহু বিয়ের কারণে সামাজিক পরিবেশ বিপন্ন হতে চলছে। স্থানীয় জনমত অনুসারে, চরাঞ্চলে বহু বিয়ে ও মৌসুমী বিয়ে (Seasonal Marriage)-র মাধ্যমে সুবিধাবাদী শ্রেণীর লোকেরা জমি ও নারীর ভোগ দখল অব্যাহত রেখে চলছে। প্রতারণা, লাঞ্ছনা আর নির্যাতন নদীভাঙা নারীদের জীবনে নিত্য দিনের ঘটনা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীদের বঞ্চনার চিত্র আরো করুণ।

অবকাঠামো

নৌ-পথ

চাঁদপুর জেলার নদী-নালার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। যোগাযোগ ও প্রশাসনের প্রেক্ষিতে নদী সিস্টেম গুরুত্ব বহন করে আসছে। চাঁদপুর বাংলাদেশের দ্বিতীয় নদীবন্দর। নৌপথে বাণিজ্য ও ব্যবসার জন্য এর সুখ্যাতি রয়েছে। চাঁদপুর দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টীমার ঘাট। এখানে দৈনিক স্টীমার সার্ভিস রয়েছে। রেলওয়ে স্টেশন ও স্টীমার ঘাট থেকে মেঘনার নৈসর্গিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম।

জেলায় মোট ১৯০ নটিক্যাল মাইল নৌ-পথ রয়েছে। জেলায় ছয়টি উপজেলার মধ্যেকার নৌপথের পরিমাণ ৯১ নটিক্যাল মাইল। কচুয়া উপজেলা নৌপথে সংযুক্ত নয়। জেলার নৌ পরিবহন ব্যবস্থায় মোট ১৮টি ঘাট বা নৌ বন্দর দেখা যায়। এর মধ্যে ১টি নৌ টার্মিনাল, ১৬টি লঞ্চ ঘাট ও ১টি ফেরী ঘাট রয়েছে।

চাঁদপুরের শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ১৯৯৯ সালে ডাকাতিয়া নদীর উপর আব্দুল আউয়াল সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ২০০৩ সাল নাগাদ প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতুটির ৯০% কাজ সমাপ্ত হয়। বর্তমানে নতুনবাজার এলাকার অ্যাপ্রোচ সড়কের ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। ১৯৯৮ সালে নোয়াখালীর চাটখিল ও চন্দ্রগঞ্জ এবং চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার জনগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য মেহের পানিওয়ালা-চাটখিল-চন্দ্রাগঞ্জ সড়কের ডাকাতিয়া নদীর ওপর ছিকুটিয়া সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। সেতুর মূল অংশের কাজ শেষ হলেও অ্যাপ্রোচ রোডের কাজ শেষ হয়নি। বিকল্প যাতায়াত হিসেবে নৌকা রিকশাসহ জনগণ মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে যাতায়াত করছে।

উপজেলা ভিত্তিক নৌপথের বিবরণ

উপজেলা	নৌপথ (নটিক্যাল মাইল)
সদর	২৮
হাজীগঞ্জ	৮
ফরিদগঞ্জ	১৯
মতলব (উঃ)	১১
মতলব (দঃ)	০৫
হাইমচর	১২
শাহরাস্তি	৮
মোট	৯১

রাস্তা-ঘাট

বি.বি.এস., ২০০৩-এর তথ্য অনুযায়ী চাঁদপুর জেলায় মোট ১,৩৪৮ কি.মি. পাকা রাস্তা রয়েছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগের মোট ২৯৮ কি.মি. রাস্তার মধ্যে ২৩৮ কি.মি. ফিডার রোড-এ ও ৬০ কি.মি. আঞ্চলিক মহাসড়ক। উল্লেখ্য, চাঁদপুর জেলায় জাতীয় মহাসড়ক নেই। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) ১৫২ বর্গ কি.মি. ফিডার রোড-বি, ৩৫৮ কি.মি. গ্রামীণ রাস্তা, ৫৪০ কি.মি. গ্রামীণ রাস্তা ধরন-২ রয়েছে। জেলায় রাস্তার ঘনত্ব ০.৭৯ কি.মি./ বর্গ কি.মি., যা উপকূলীয় অঞ্চল ও জাতীয় অবস্থার তুলনায় ভাল।

রাস্তা-ঘাটের বিবরণ

মোট পাকা রাস্তা	১,৩৪৮ কি.মি.
সওজ রাস্তা	২৯৮ কি.মি.
এলজিইডি রাস্তা	১,০৫০ কি.মি
রাস্তার ঘনত্ব	০.৭৯ কি.মি./ বর্গ কি.মি

রেল-পথ

চাঁদপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বৃটিশ শাসনামলে স্টীমারে চাঁদপুর থেকে গোয়ালন্দে এবং গোয়ালন্দ থেকে কলকাতায় রেল যোগাযোগ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। জেলায় মোট ৪২ কি.মি. দীর্ঘ রেলপথ আছে। সদর, হাজীগঞ্জ ও শাহরাস্তি উপজেলার উপর দিয়ে এই রেলপথ অতিক্রম করেছে।

১৮৮৪ সালে ঐতিহ্যবাহী চাঁদপুর রেলওয়ে স্টেশনটি স্থাপিত হয়। এক সময় আসাম থেকে কলকাতায় যাবার স্বর্ণদ্বার বলে বিবেচিত এই স্টেশনটি আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। ২০০১ সালে মেঘনার ভয়াবহ ভাঙনে এই স্টেশনটি পুরোপুরি বিলীন হয়ে যায়। সেই সময়ে স্টেশনটি পূর্বের জায়গা থেকে ৩০০০ গজ দূরে একটি পরিত্যক্ত টিন শেড ঘরে সরিয়ে নেয়া হয়। ফলে, চাঁদপুর স্টেশন শত বছরের পুরনো ঐতিহ্য সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলে। বর্তমানে এই স্টেশন থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক বরিশাল, খুলনা, পটুয়াখালী ও ভোলার দিকে যাতায়াত করে।

রেল পথের বিবরণ

উপজেলা	রেল পথ(কি.মি.)
সদর	৯
হাজীগঞ্জ	১৩
শাহরাস্তি	২০
মোট	৪২

পোল্ডার

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষার তাগিদে ষাটের দশকে চাঁদপুর জেলায় পোল্ডার নির্মাণের কাজ শুরু হয়। অতিবর্ষণ ও বন্যার কারণে চাঁদপুরের তিনটি বাঁধ ভাঙনের আতংকে রয়েছে। এগুলো হল হাইমচর চাঁদপুর সেচ প্রকল্প বাঁধ, মতলবের মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প বাঁধ ও চাঁদপুর শহর রক্ষা বাঁধ।

উল্লেখ্য, চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের ১০০ কি.মি. জুড়ে ১০ লাখ মানুষের বসবাস এবং এই প্রকল্পের হাইমচর উপজেলার ১০ কি.মি. বাঁধ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এখানে মেঘনার ব্যাপক ভাঙনে কাটাখালী থেকে চর ভৈরবী পর্যন্ত প্রায় ২ কি.মি. বাঁধ সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে। গ্রামীণ রাস্তা ও রিং বাঁধের কারণে এ প্রকল্পটি কোনমতে টিকে আছে।

অন্যদিকে, মতলবের মেঘনা-ধনাগোদা বাঁধটি ১৪টি ইউনিয়নের ৬০ কি.মি. জুড়ে বিস্তৃত। এর আওতায় ৬৫ কি.মি. দীর্ঘ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ, ২২০ কি.মি. দীর্ঘ সেচ খাল ও ১২৫ কি.মি. দীর্ঘ নিষ্কাশন নালা রয়েছে। ৬০ ফুট প্রশস্ত ও ১৫ ফুট উঁচু এ বাঁধটির এক পাশ থেকে পানি উপচে পড়ার অবস্থা হলেও অন্য পাশে পানি না থাকায় বিভিন্ন স্থানে ফাটলসহ বাঁধ ভেঙে পড়ার আশংকা রয়েছে। মেঘনা-ধনাগোদা বেড়িবাঁধের নন্দলালপুর বাজার সীমানায় ভেঙে যাওয়া অংশ এখনো বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে। সাধারণ মানুষের ঐকান্তিক সহযোগিতা, পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) ও সেবা সহযোগিতায় বাঁধটি রক্ষার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মেঘনা-ধনাগোদা নদীর পাশে হওয়ায় মতলব উপজেলা অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

চাঁদপুর শহর রক্ষা বাঁধের উপর চাঁদপুর শহরের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। শহর রক্ষা বাঁধের বড় স্টেশন এলাকার "মোলহেড"টি মেঘনা ও ডাকাতিয়ার ছোবল থেকে রক্ষার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

চাঁদপুর শহর তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের মোলহেড এলাকায় নদীর গভীরতা ২৫ থেকে ৩০ ফুট। ডাকাতিয়া-মেঘনা মোহনায় এই গভীরতা ৪৫ থেকে ৫০ ফুট। মেঘনা বরাবর ৬০ মিটার এবং ডাকাতিয়া বরাবর ৪০ মিটার এলাকায় নদীর তলদেশে বড় বড় গভীর খাদের সৃষ্টি হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড শহর রক্ষা বাঁধের বড় স্টেশন এলাকাকে

ঝুঁকিপূর্ণ এবং মোলহেডকে অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে এ এলাকায় সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

হাট-বাজার ও বন্দর

রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন, মানুষের চাহিদা, ভোগ্য পণ্যের বিস্তারের কারণে জেলায় হাট বাজারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। জেলায় মোট ১৮২টি ছোট ও বড় হাট বাজার রয়েছে। এর মধ্যে পুরানবাজার, নতুনবাজার, বাবুরহাট, কচুয়া, ফরিদগঞ্জ, ফতেহ্পুর, শুটিপাড়া, বেগমবাজার, হাজীগঞ্জ, ওয়ারুখ, মতলব, শাহ্তলী, ষাটনল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। ডাকাতিয়া নদীর তীরবর্তী ফরিদগঞ্জ উপজেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানকার প্রধান বাণিজ্য পণ্যদ্রব্য বলতে পাট, মরিচ, সুপারির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। চাঁদপুর বন্দর একসময় পাট ও খাদ্যশস্য বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো। বর্তমানে চাঁদপুর নদী বন্দরে জাহাজ নির্মাণ, লবণ বিশুদ্ধকরণ, মাছ ধরার জাল তৈরীর ও তেল উৎপাদনের ব্যবসা চালু রয়েছে।

হাটবাজারের খতিয়ান

উপজেলা	সংখ্যা
সদর	২৪
হাজীগঞ্জ	৩২
কচুয়া	৩২
ফরিদগঞ্জ	৩৭
মতলব (উঃ)	১৭
মতলব (দঃ)	১৪
হাইমচর	১৪
শাহরাস্তি	১২
মোট	১৮২

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

জেলার বিভিন্ন স্থানে মোট ৫টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে (এলজিইডি, ২০০৩)। এগুলো ঘুর্ণিঝড়ের সময় জান-মালের নিরাপত্তা দেয়। অন্য সময়ে বিদ্যালয় ও খাদ্য গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ

চাঁদপুর জেলায় বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘরের সংখ্যা ১,২২,৬৮০, যা মোট ঘরের ২৯%। তবে শহর ও গ্রামে বৈদ্যুতিক সংযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। শহরের মোট ৫৬% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। অথচ গ্রামে এর পরিমাণ মাত্র ২৫%। এই হার নগরায়ণের বিস্তারকে চিহ্নিত করে। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে জেলার মাত্র ১০% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল (বি.বি.এস., ১৯৯৪, ২০০১)।

% শহরে বিদ্যুৎ সংযোগ	৫৬%
% গ্রামীণ বিদ্যুৎ সংযোগ	২৫%
পল্লী বিদ্যুৎ সংযোগ	১,৭০৪ বর্গ কি.মি.

চাঁদপুর শহরের গনুরাজদীর কাছে "চাঁদপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র" (Chandpur Electric Supply) ১৯৬৩ সালে স্থাপন করা হয়। ১৯৬৬ সালে ১৫০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ক্ষমতাসম্পন্ন এই কেন্দ্রটি প্রথম চালু করা হয়।পল্লী বিদ্যুতের ক্ষেত্রে চাঁদপুর স্টেশন থেকে সমগ্র জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় চাঁদপুর স্টেশন থেকে জেলায় মোট ১,৭০৪ বর্গ কি.মি. এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে বর্তমানে জেলায় মোট টেলিফোন সংযোগের সংখ্যা ১,৪৬৩টি (বি.বি.এস., ১৯৯৮)। এ ছাড়া জেলার ৪,৮৯০টি ঘরে গ্যাস সংযোগ আছে (বি.বি.এস., ১৯৯৮)।

শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপীয় ও ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এখানে কয়টি পাট কল স্থাপন করেন। কিন্তু, ১৯৪৭ সালে পাক-ভারত বিভক্তির সময়ে বেশিরভাগ ব্যবসাই বন্ধ হয়ে যায়। চাঁদপুর জেলায় একসময় বেশ কয়টি পাট প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ছিল। ১৯১০ সালে এখানে ৭টি ইউরোপীয় ও ২টি ভারতীয় ফার্ম পাট জাগ দেয়ার ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল।

জাহাজ তৈরি, লবণ বিশুদ্ধকরণ, মাছ ধরার জাল তৈরি এবং তৈল উৎপাদন কারখানা রয়েছে। ভারী শিল্প কারখানার মধ্যে ১১টি পাটকল, ১৮৫টি ধান ও আটার কল, ১৪টি বরফকল, ৪টি কোল্ডস্টোরেজ, ১টি কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, ১টি লৌহ কারখানা, ১টি অ্যালুমিনিয়াম কারখানা এবং ২টি দেশলাই কারখানা অন্যতম। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে তাঁত, শীতল পাটি, মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেতের কাজ, মাছ ধরার জাল তৈরী, কর্মকার ও লোহাকার অন্যতম।

সেচ ও গুদাম সুবিধা

সেচ এলাকা (মোট)	৫৪,৪৭৪ হে.
সেচ এলাকা (%)	৫১%
ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার	১২ %
উপরিভাগের পানি ব্যবহার	৩৯ %

চাঁদপুরের কৃষকরা আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী - দুই ধরনের প্রযুক্তিই ব্যবহার করেন। এখানে আধুনিক সেচ প্রযুক্তি বলতে প্রধানত নলকূপ, গভীর ও অগভীর নলকূপ, এলএলপি, পাম্প ইত্যাদিকে বুঝায়। জেলায় মোট সক্রিয় অগভীর নলকূপের সংখ্যা ২১৯টি, এলএলপি ১,৪৯২টি, গভীর নলকূপ ৩০২টি, পাম্প ১,১৬৪টি এবং ৯,৭৩৯টি নলকূপের আওতায় মোট ৫৪,৪৭৪ হে. জমিতে সেচ দেয়া হয় (বি.বি.এস., ১৯৯৮)।

উল্লেখ্য, জেলার সামগ্রিক সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে মতলব উপজেলার মেঘনা-ধনাগোদা প্রকল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এর মাধ্যমে ১৯,০২১ হে. এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রন ও পানি নিষ্কাষণ ও ১৪,৪০০ হে. জমির সেচের পানি সরবরাহ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় দুটো পাম্পিং স্টেশন রয়েছে। একটি ৪৩.৩৫ কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন উদামদী পাম্পিং স্টেশন এবং অপরটি ২৮.৯ কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন কালিপুর স্টেশন। এই পাম্পগুলো দিয়ে সেচ ও নিষ্কাশন উভয়ের কাজ চলে। এ ছাড়াও দুটো বোস্টার পাম্পিং স্টেশন আছে। একটি এখলাসপুরে (২.২৬ কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন) এবং অন্যটি দুবগী-তে (৩.৪ কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন)।

গুদামের ধরন	সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা (মে.টন)
খাদ্য	১৬	২১,৫০০
বীজ	৫	৫৭৫
সার	৫	৭,৪২৫

চাঁদপুরে উৎপাদিত কৃষিপণ্য গুদামজাতকরণের সুবিধা অত্যন্ত সীমিত। বি.বি.এস., ১৯৯৮ অনুসারে, এই জেলায় মাত্র ১৬টি খাদ্য গুদাম রয়েছে। যাদের প্রতিটির খাদ্যদ্রব্য ধারণ করার ক্ষমতা হল ২১,৫০০ মে. টন। এ ছাড়া এখানে বীজ সংরক্ষণের জন্য ৫৭৫ মে. টন ধারণ ক্ষমতার ৫টি গুদাম আছে। সার সংরক্ষণের জন্য ৫টি গুদাম আছে, যাদের প্রতিটির ধারণ ক্ষমতা হল ৭,৪২৫ মে. টন।

সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

চাঁদপুর জেলায় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। চাঁদপুরে মোট ৪৬০টি ক্লাব, ৯টি গণ গ্রন্থাগার, ১৩টি সিনেমা হল, ১৪টি থিয়েটার দল, ৫টি সুশীল সমাজ, ২টি পার্ক, ৪৫টি যুব সংগঠন, ৩,১২৯টি সমবায় সমিতি, ৪৫১টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং ১৫টি নারী সংগঠন রয়েছে।

উল্লেখ্য, জেলায় মোট ২,৮৫২টি মসজিদ, ২টি খৃষ্টীয় উপাসনালয়, ২৮৬টি মন্দির আছে। কিছু পুরান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বেগম মসজিদ, শাহ্ সুজা মসজিদ, ফিরোজ খান মসজিদ, পাশা গাজী মসজিদ, পালগিরি মসজিদ, মাড়াখানা মসজিদ, রাস্তি শাহ্ দরগা, লক্ষ্মীনারায়ণ জেওড়ের আখড়া, চাঁদপুর কালিবাড়ী, আজাছক আশ্রম, কুণ্ডুবাড়ি দুর্গা মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন, হরিসভা, নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিজ ও মিহির কালি বাড়ির নাম উল্লেখযোগ্য।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান

National Agricultural Research System (NARS) - এর আওতাধীন বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের Riverine Staton টি চাঁদপুর সদর উপজেলায় অবস্থিত। এর আয়তন ১৭.২ হেক্টর। এখানে রয়েছে ৩৬টি অনিষ্কাষনযোগ্য পুকুর, যাদের প্রতিটির আয়তন ০.১২ থেকে ০.৩৭ হেক্টর পর্যন্ত। মোট ৯ হেক্টর এলাকা

জুড়ে রয়েছে জলাভূমি। এ ছাড়াও এই স্টেশনে রয়েছে ১টি কার্প, একটি শিং-মাগুর ও একটি Machroloracthium হ্যাচারী; দুটো গভীর নলকূপ; একটি বিশেষ ধরণের গবেষনাগার; একটি গ্রন্থাগার; অফিস বিল্ডিং; আবাসিক কোয়ার্টার এবং একটি গেস্ট হাউজ। এ ছাড়া নদী বিষয়ক জরীপ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অত্যাধুনিক গবেষণাগার সমৃদ্ধ একটি যন্ত্রচালিত নৌযান, একটি Global Positioning System বা GPS মেশিন এবং তিনটি স্পিড বোট রয়েছে। এই ষ্টেশন ৭টি বিভাগ নিয়ে গঠিত: প্রশাসন বিভাগ; মজুদ পর্যালোচনা ও সম্পদ পরিসংখ্যান; লিমনোলজি (Limnology) ও উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য ব্যবস্থাপনা; চাষযোগ্য মৎস্য ব্যবস্থাপনা; সমুদ্র দুষণ ও Fish Toxicology; জীব বৈচিত্র্য, মৎস্য প্রজাতি সম্পদ এবং সংরক্ষণ; মৎস্য আচরণ ও মাছ ধরার প্রযুক্তি বিভাগ। উল্লেখ্য এই ষ্টেশনে ২৫ জন বৈজ্ঞানিক ও ৬০ জন কর্মকর্তা আছেন।

উন্নয়ন প্রকল্প

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০০৪-২০০৫ অনুসারে চাঁদপুরে মোট ৮টি সরকারি সংস্থার মোট ১৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, এখানে যে সব প্রকল্প কেবল ২০০৪ সালের পরেও চালু আছে ও থাকবে তাদের হিসাব তুলে ধরা হয়েছে।

সরকারি সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	৪
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১
স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদফতর	২
জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদফতর	৪
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	১
সড়ক ও জনপথ বিভাগ	৩
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	২
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	২
মোট প্রকল্প সংখ্যা	১৯

যে সমস্ত সরকারি সংস্থার মাধ্যমে এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে তা হল বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদফতর, জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদফতর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি। এই প্রকল্পগুলো প্রধানত বাংলাদেশ সরকার, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (IDA), ইউরোপিয়ান কমিশন (EC), বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (WFP), নেদারল্যান্ডস সরকার (GoN), যুক্তরাজ্য সরকার (DfID), ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IDA), কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী (CIDA), ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (UNDP), গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাসিলিটি (GEF), এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB), ইউনিসেফ (UNICEF) কুয়েত সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ।

ক্ষুদ্রঋণ কর্মকাণ্ডের খতিয়ান	
ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারী গৃহস্থ (জন)	৭৯,৭৩০
% গৃহস্থ (মোট)	১৯%
মোট ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকা)	৬২.৫৫
গৃহস্থ প্রতি ঋণের পরিমাণ (টাকা)	৭,৮৪৫

চাঁদপুর জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও-র উন্নয়ন কর্মকাণ্ড রয়েছে। বড় এনজিওগুলোর মধ্যে ব্র্যাক, আশা, কেয়ার-বাংলাদেশ, প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক -এর নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া স্থানীয় এনজিও-র মধ্যে আত্মনিবেদিত, আমন, বিএভিএস, ভিএসওডি, Save Our Life - এর কথা বলা যায়, যারা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলছে। প্রধান চারটি বড় এনজিও আশা, ব্র্যাক, প্রশিকা ও কারিতাস-এর ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত জেলার মোট ১৯% গৃহস্থ। গৃহস্থ প্রতি ঋণের পরিমাণ ৭,৮৪৫ টাকা মাত্র (পিডিও-আইসিজেডএমপি, ২০০৩)। এ ছাড়া জেলার দুঃস্থদের নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য সমাজ সেবা অধিদপ্তর এবং বিশ্ব খাদ্য সংস্থা কাজ করছে।

হাইমচর : 'ভাঙন থাইক্যা বাঁচতে আমরা আর কই যামু?
মতলবে ৩০ হাজার চরবাসীর একমাত্র প্রাইমারী স্কুলটিও এখন বন্ধের উপক্রম
বিলুপ্তির পথে জাতীয় মাছ ইলিশ
চাঁদপুরে ডিজেল ও তেল সংকট :
মতলবে কৃষিঋণ বিতরণে অনিয়ম
১০ হাজার টাকা নিতে ঘুষ ৩ হাজার, বঞ্চিত প্রকৃত কৃষক
মেঘনার ভাঙনের মুখে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প
সর্বাধিক আর্সেনিক আক্রান্ত অঞ্চলে সর্বনিম্ন প্রতিরোধ
সরেজমিন চাঁদপুর
মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের ৯ হাজার হেক্টর জমির ফসল নষ্ট
জলাবদ্ধতায় ভেসে গেছে ১০ কোটি টাকার মাছ

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

ইলিশের দেশ হিসেবে খ্যাত চাঁদপুর আজ নানা দুর্যোগে পর্যুদস্ত। তাই চাঁদপুরের পরিচিতি এখন ভাঙনের শহর হিসেবে। চাঁদপুরের মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক এবং নিজেদের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ এবং প্রতিবন্ধকতার প্রভাব অপরিসীম। অব্যাহত নদী ভাঙন, আর্সেনিক দূষণ ও বন্যায় সামগ্রিক প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। ২০০৩ সালে এই জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের সাথে এই বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমাজের মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ, সম্পদের বন্টন বা ব্যবহার, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্টি হওয়া কিছু প্রধান সমস্যার কথা আলোচিত হয়। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের গবেষণা (২০০২, ২০০৩) ও আলোচনা (২০০৩) থেকে জেলার মানুষের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার যে চিত্র ফুটে উঠে তার উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হল:

পরিবেশগত সমস্যা

মেঘনার ভয়াবহ ভাঙন : নদী ভাঙনের কারণে গত ২০ বছরে চাঁদপুরের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসহ প্রায় ১৫ বর্গমাইল এলাকা নদীতে তলিয়ে গেছে। এতে লোকজন গৃহহীন হয়ে পড়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য থমকে দাঁড়িয়েছে। চাঁদপুর সদর ও হাইমচর উপজেলায় মেঘনার ভাঙন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। সদর উপজেলার হরিণা, গোবিন্দ এবং আল্লাহ্ বস্তি বাজার এলাকা এবং হাইমচরের চর সোলাদী, নীলকমল এলাকা এখন পানির নিচে। ভাঙন প্রতিরোধে শুকনো মৌসুমে ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া দরকার। কিন্তু বেশিরভাগ সময় ভাঙন শুরু হয়ে যাবার পর বরাদ্দ প্রাপ্তির কারণে কর্তৃপক্ষ স্থায়ী সমাধান দিতে ব্যর্থ হন। আশার কথা এই যে, ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে চাঁদপুর শহরকে নদীভাঙন থেকে রক্ষার জন্য ১০৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের আংশিক বরাদ্দ দিয়ে ২০০৫ সালের মার্চ মাসে প্রতিরক্ষা কাজ শুরু হবে।

বন্যা : চাঁদপুরের প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম বন্যা। প্রতিবছর এই জেলা কম বেশি বন্যায় আক্রান্ত হয়। ২০০৪ সালের বন্যায় চাঁদপুর শহরের অধিকাংশ স্থান তলিয়ে যায়। জেলার ৮৭টি ইউনিয়নের ৬৬টিই বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে। সদরের স্টীমার ঘাট ডুবে যাওয়ায় চাঁদপুর, চট্টগ্রাম-খুলনা আঞ্চলিক সড়কের উপর হরিণা-শরিয়তপুর ফেরি ঘাট, চাঁদপুর-ফরিদগঞ্জ সড়কের ইছোলি ফেরি ঘাট, চাঁদপুর-চর ভৈরবী সড়কের নতুন বাজার ফেরিঘাট এবং চাঁদপুর-মতলব উত্তর সড়কের মতলব ফেরিঘাট সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জেলার ৮টি উপজেলার ৬০টি ইউনিয়নের ১০ লাখ লোক পানিবন্দী হয়ে পড়ে। মেঘনা নদী বিপদসীমার ১২৫ সে.মি. উপর দিয়ে

পরিবেশগত সমস্যা
- মেঘনার ভয়াবহ ভাঙন
- বন্যা
- আর্সেনিক দূষণ
- নদী ভরাট
- ডুবোচর কেটে নেয়া
- ডাকাতিয়া নদী দখল
- ভূমি ক্ষয়
- জলোচ্ছ্বাস
- জোয়ার
- ঘূর্ণিঝড়
- জলবায়ুর পরিবর্তন

কৃষি সমস্যা
- ইলিশের আকাল
- মাটির উর্বরতা হ্রাস
- বাঁধ কেটে দেয়া
- কৃষি উপকরণ ও সেচ সংকট
- পান চাষের প্রতিবন্ধকতা

আর্থ-সামাজিক সমস্যা
- নিরাপদ পানি সংকট
- পানির পাম্প
- গৃহায়ন সমস্যা
- অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ
- ধীর গতির পুনর্বাসন কর্মসূচী কাজের অভাব
- স্বাস্থ্য সেবা
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি
- বাঁধ সংরক্ষণ
- বিপদাপন্নতা

যোগাযোগ সমস্যা
- সেতু নির্মাণে অনিয়ম
- নৌ চলাচলে সমস্যা
- নৌ-দুর্ঘটনা

প্রবাহিত হয়। সড়কপথে যোগাযোগ ভেঙ্গে পড়ে।

আর্সেনিক দূষণ : আর্সেনিক সমস্যা সমগ্র চাঁদপুর জেলাকে গ্রাস করেছে। জেলার মানুষের জীবনে আর্সেনিক দূষণ একটি ভয়াবহ হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অজ্ঞতা, তথ্যের অভাব আর কুসংস্কারের ফলে জেলার নিরীহ মানুষেরা আর্সেনিক দূষণের কারণে আজ নানা সামাজিক সমস্যার শিকার।

মাটি ও পানির লবণাক্ততা : অপরিকল্পিত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও নদী শাসন ব্যবস্থা এবং জটিল পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কারণে জেলার নদ নদীগুলোতে সৃষ্টি হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী লবণাক্ততা ।

ডুবোচর কেটে নেয়া : মেঘনার বুকে ডুবোচর কেটে নেয়া হচ্ছে। প্রতি বছর শুকনো মৌসুমে মেঘনায় জেগে থাকা বালি চর ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে অবৈধভাবে কাটা হয় এবং এতে মেঘনায় ব্যাপক গভীরতার সৃষ্টি হয়। ফলে, বর্ষায় মেঘনার পাড়ের বিভিন্ন অংশে ভাঙন ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

ডাকাতিয়া নদী দখল : দখল হয়ে যাচ্ছে ডাকাতিয়া নদী। কেননা ডাকাতিয়া নদীর দু'তীর এবং তীরসংলগ্ন জেগে ওঠা চরে মাটি ভরাট করে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ শুরু হয়েছে। বন্দর আইন অনুযায়ী নদীর স্বাভাবিক জলসীমার ৫০ গজ তটভূমি পর্যন্ত কোন ধরনের স্থাপনা নির্মাণের নিয়ম নেই। অথচ তা সত্ত্বেও এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ডাকাতিয়া নদী দখল করে অপরিকল্পিত উপায়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা গড়ে তুলছে। ফলে নদীর স্বাভাবিক গতি ও প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে, ত্বরান্বিত হচ্ছে ভাঙন। শুধু তাই নয়, নদীর দু'তীরের ৩৭ একর সরকারি খাস জমির বড় অংশ নদীর ভাঙনে তলিয়ে যাচ্ছে। নদী ভরাট করে স্থাপনা বা অবকাঠামো গড়ে তোলায় বর্ষায় নদী প্রবাহ গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে ভাঙন সৃষ্টি করে।

ভূমি ক্ষয় : নদীর স্বাভাবিক গতিপথে বাঁধা দিলে নদীতে ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়। এতে ঘূর্ণির আঘাত স্থানে ভূমি ক্ষয় বেড়ে যায়, যা মেঘনায় ঘটছে।

জলোচ্ছ্বাস : জলোচ্ছ্বাস নদীর তীরে ভেঙে পড়ে। মাঠ-ঘাট ও জনপদ তলিয়ে যায়। বন্যা পরিস্থিতিকে দীর্ঘায়িত করে তোলে।

জোয়ার : জোয়ারের পানিতে ভেসে যায় মাঠের ফসল। কোন কোন জায়গায় সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা ও বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ঘূর্ণিঝড় : প্রতি বছর মার্চের শেষ থেকে জুন-জুলাই পর্যন্ত এই জেলায় ঘূর্ণিঝড়ের আশংকা থাকে। ক্ষণস্থায়ী এই টর্নেডো জেলার সম্পদ ও জনপদে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।

জলবায়ুর পরিবর্তন : জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে নদী তীরবর্তী চাঁদপুরের প্রাকৃতিক সম্পদ তথা মানুষের জীবন জীবিকায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

কৃষি সমস্যা

ইলিশের আকাল : চাঁদপুরের অনন্য সম্পদ মেঘনার ইলিশ। অথচ এই চাঁদপুরেই আজ ইলিশের আকাল। অনিয়ন্ত্রিতভাবে মাছ ধরার ফলে মেঘনা-ডাকাতিয়া ইলিশশূন্য হয়ে পড়েছে। জেলার আড়তগুলো দক্ষিণাঞ্চলের জেলেদের ধরা ইলিশে ছেয়ে গেছে। অতিরিক্ত জাটকা নিধনে মাছশূন্য হয়ে পড়েছে মেঘনা নদী। ২০০২ সালের

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ঐ বছর সারা দেশে মোট ১৯,০০০ টন জাটকা ধরা হয় এবং এর মধ্যে ১৮,০০০ টন ধরা হয় চাঁদপুর থেকে। এই জাটকার ১০% পর্যন্ত রক্ষা করা গেলে চাঁদপুর জেলা ইলিশ রপ্তানিতে ২ কোটি টাকা প্রবৃদ্ধি পেত।

মাটির উর্বরতা হ্রাস : সার ও কীটনাশকের ব্যবহার চাঁদপুর জেলার কৃষকদের অসচেতনতা আর সার ব্যবসায়ীদের অসাধুতার কারণে ইরি ও বোরো ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে যাবার আশংকা করা হচ্ছে।

বাঁধ কেটে দেয়া : বন্যার পানি সরিয়ে দেবার জন্য স্থানীয় লোকেরা অনেক সময় নিজেদের উদ্যোগে বাঁধ কেটে দেয়, যা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কেননা বাঁধের ভেতরের ও বাইরের বাসিন্দাদের এই স্থানীয় উদ্যোগে এক পক্ষ লাভবান হলেও আরেক পক্ষ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কৃষি উপকরণ ও সেচ সংকট : কৃষি উপকরণ, জ্বালানি বা সেচ সংকট জেলার কৃষি ব্যবস্থার অন্যতম সংকট। প্রতি বছর জানুয়ারি থেকে মধ্য মাসে ইরি, বোরো বোনার মৌসুমে জীব, সার ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে কৃষকরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। জেলার খাল নালা স্লুইস গেটের সংস্কারের অভাব এই সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তোলে জোয়ারের পানি খাল-নালায় ঢুকতে না পারায় কৃষকদের পাম্প চালিত সেচের উপর নির্ভর করতে হয়। আর তাই জ্বালানি সংকট এবং সার কীটনাশকের মূল্য বৃদ্ধিতে কৃষি কাজ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পান চাষের প্রতিবন্ধকতা : প্রতি বছর বন্যায় পানের বরজ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাইমচর জেলার পান চাষের ক্ষেত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। এবছর এখানে প্রায় ১১ কোটি টাকা মূল্যমানের ৮০ হে. জমিতে এবং পুরো জেলায় মোট ২৬০ হে. জমিতে পান চাষ করা হয়। যার মধ্যে ৮০ হে. জমির পান সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস এবং ৪০ হে. জমির পান আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (প্রথম আলো, ২০০৪)।

আর্থ-সামাজিক সমস্যা

নিরাপদ পানি সংকট : চাঁদপুরের নাগরিক সমস্যার মধ্যে অন্যতম নিরাপদ পানি সংকট। চাঁদপুর শহরে ৪ হাজার গ্রাহকের পানির চাহিদা ৩০ লাখ গ্যালন। অথচ পৌরসভার ৪টি পাম্প ও ২টি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে প্রতিদিন মোট ১২ লাখ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হয়। এর মধ্যে প্রতিদিন ১৬ হাজার গ্যালন পানি চুরি হচ্ছে। বিদ্যুৎ সমস্যা ও পাম্পের ত্রুটির কারণেও পানির উৎপাদন অনেক কমে আসে। তাই প্রতিদিন গড়ে ১৮ লাখ গ্যালন পানির ঘাটতি থেকেই যায়। চাঁদপুর শহর বাণিজ্যে নগরী হিসেবে চিহ্নিত হলেও বিদ্যুৎ ও পানির উৎপাদন ঘাটতি দিন দিন তীব্র আকার ধারণ করছে। চাঁদপুর শহরে বন্যায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। পৌরসভার পানি সরবরাহ লাইনে ফাটল ধরায় স্যুয়ারেজের নোংরা পানি মিশে পরিস্থিতি জটিল করে তুলছে।

পানির পাম্প : শহরের পানির সংকট নিরসনে কোড়ালিয়া ও বিপনিবাগে যে দুটো গভীর নলকূপ স্থাপনের কথা ছিল তার একটিতে অর্থাৎ কোড়ালিয়া প্রকল্পটি ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে। বিপনিবাগ গভীর পাম্প স্থাপন প্রকল্পটি ২০০৪ পর্যন্ত চালু করা হয়নি। তবে শহরের মানুষের চাহিদা যথার্থভাবে পূরণ করতে আরো নতুন পাম্প হাউস স্থাপন করা জরুরি হয়ে পড়ছে।

গৃহায়ন সমস্যা : চাঁদপুর শহরে আধুনিক স্থাপনা তৈরির হার কমে গিয়েছে। ভাঙন আতংকের কারণে চাঁদপুর শহরবাসীরা গৃহায়ন ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণে এখন সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। তাই অনেকেই এখন নিজ বাসাবাড়ি তৈরি বা সংস্কারের সময় এ নিয়ে অসংখ্যবার চিন্তা করেন। আর তাই চাঁদপুর শহরে এখনো টিনের ঘরের সংখ্যা বেশি।

অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ : এক দশক আগে ডাকাতিয়ার উত্তর তীরে মুখার্জিঘাট থেকে ৩নং ঘাট পর্যন্ত বড় চর জেগে ওঠে। তারপর থেকেই শহরের ৩নং ঘাট, ৫নং ঘাট, চৌধুরীঘাট এলাকায় অবৈধভাবে আরসিসি পিলার দিয়ে পাকা দালান কোঠা নির্মাণ শুরু হয়। তাই নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হয়ে পলি জমতে শুরু করে। নতুন চর পড়ে ডাকাতিয়া নদী সংকীর্ণ হতে শুরু করে। ফলে, বর্তমানে মেঘনা মোহনা থেকে ইচুলী পর্যন্ত নদীর প্রশস্ততা এক-তৃতীয়াংশে এসে দাঁড়িয়েছে। এটি চলতে থাকলে মেঘনার শাখা নদী ডাকাতিয়ার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে।

পুনর্বাসন কর্মসূচী : নদী ভাঙনে বিপর্যস্ত জনপদের পুনর্বাসন কর্মসূচী ধীর গতিতে চলে। ফলে মানুষ বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার আগেই আরেকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়।

কাজের অভাব : চাঁদপুরে জেলেদের মধ্যে কাজের অভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মৎস্য অভয়ারণ্যে জাটকা নিধন বন্ধ করতে পদ্মা ও মেঘনায় যে কোন ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধ হওয়ায় জেলেরা মাছ ধরতে পারছে না। ফলে কেবলমাত্র সদর ও হাইমচর উপজেলার ৪০০০ জেলে কর্মহীন হয়ে পড়েছে (প্রথম আলো, ২০০৪)। নদীতে মাছ নেই, আছে ডাকাতের উৎপাত। তাই জেলেরা মাছ ধরতে যেতে পারে না। কর্মহীন হয়ে ঘরে বসে থাকতে হয়।

চাঁদপুরের চরাঞ্চল ও গ্রামে কাজ নেই। নদী ভাঙনে সবকিছু খুইয়ে মানুষ আর্থিক কষ্টের শিকার। তাই তারা নিরন্তর কাজ খোঁজে। কাজ জুটলেও মজুরি পায় সামান্য। তাই মানুষ অভাব অনটন, ধার-দেনা, সুদে টাকা ধার ইত্যাদির উপর নির্ভর করে দিন কাটায়। উল্লেখ্য, বন্যা ও কৃষিখাতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার দরুন কৃষকরা চরম অর্থকষ্টে ও কাজের অভাবের মধ্যে দিনানিপাত করছে।

অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা : জেলার জনস্বাস্থ্য সেবা পরিস্থিতি নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক জটিলতার শিকার। তাই হাজার হাজার নিরীহ মানুষ রোগ-শোকে অনুকূল সেবা থেকে বঞ্চিত।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি : মেঘনাঞ্চল আজ অনেকাংশেই জলদস্যুদের নিয়ন্ত্রনে। মাছ ধরা নৌকা বা ট্রলার ডাকাতি, গণলুট, জেলে অপহরণ, মুক্তিপণ, আক্রমণে চাঁদপুরের জেলেরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। মেঘনা নদীর উপর জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রন না থাকায় জেলেদের জীবন আজ চরম সংকটের সম্মুখীন।

বাঁধ সংরক্ষণ : চাঁদপুর শহরের বড় স্টেশনের কাছে শহর রক্ষা বাঁধের মোলহেড ভয়াবহ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। উপচে পড়া পানির প্রবল স্রোতে যে কোন মুহূর্তে মোলহেড ভেঙ্গে যাবার আশংকা রয়েছে। ফলে ব্যবসাকেন্দ্র পুরানবাজারসহ চাঁদপুরের নৌবন্দর বিলীন হয়ে যেতে পারে।

বিপদাপন্নতা : বিপদাপন্নতা সমীক্ষা (সিইজিআইএস, ২০০৪)-তে জেলার প্রধান জীবিকা প্রধানত প্রাকৃতিক, ভৌত ও সামাজিক বিপদাপন্নতার শিকার। এর ফলে জেলে, ক্ষুদ্র কৃষক, চিংড়ি চাষী ও মজুরদের জীবন ও জীবিকায় নিরাপত্তাহীনতা প্রকট হয়ে উঠছে।

যোগাযোগ সমস্যা

সেতু নির্মাণে অনিয়ম : নির্মিত হবার পরও তিনটি সেতু চালু হচ্ছে না এ্যাপ্রোচ রোডের অভাবে। ডাকাতিয়া নদীর উপর আব্দুল আউয়াল সেতু এবং অন্যদিকে শাহরাস্তি উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর ওপর ছিকুটিয়া সেতুর কাজ শেষ না হওয়ায় এলাকার লোকজনের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

নৌ-চলাচলে সমস্যা : পদ্মা-মেঘনায় চাঁদপুরের জেলেদের পাতা জাল নৌ-পরিবহন ব্যাহত করে। বিশেষ করে, বর্ষার শেষে নদীতে তীব্র ঢেউ হলে স্রোতের কারণে এই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে।

জেলার প্রধান কয়টি অভ্যন্তরীণ নৌরুট চাঁদপুর-ঢাকা, চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর-সুরেশ্বর, মতলব-ঢাকা, ঢাকা-চাঁদপুর, বরিশাল-ভোলা-পটুয়াখালী-ঝালকাঠি-হুলারহাট-লালমোহন-বরগুনা-খুলনাসহ দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন রুটে দৈনিক শতাধিক যাত্রীবাহী লঞ্চ, স্টীমার, পদ্মা-মেঘনা পাড়ি দিয়ে যাতায়াত করে।

মেঘনার ষাটনল থেকে হাইমচর পর্যন্ত এবং পদ্মার রাজরাজেশ্বর থেকে গোয়ালন্দ-মাওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে জেলেরা যেখানে সেখানে নদীতে মাছ ধরে থাকে এবং এসব জালের বেশিরভাগ নদীর গভীর অংশ বা মূল নৌপথে পেতে রাখে। ফলে নৌ চলাচলে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। দিনের বেলা নদীতে ঢেউ ও স্রোতের কারণে এসব জাল দেখা যায় না এবং জালের কাছাকাছি এসে নৌকা ঘোরানো সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে পাতা জাল নৌযানের পাখায় আটকে যায় এবং ছিঁড়ে যায়। এই নিয়ে নৌপথে জেলে ও নৌযান চালকদের প্রায়ই ঝগড়া ঝাটি হয়। ফলে, স্বাভাবিক নৌপরিবহন ব্যাহত হয়।

নৌ-দুর্ঘটনা : চাঁদপুরে নদী পথে কালবৈশাখী ও বর্ষা মৌসুমে হরহামেশা নৌ-দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এ ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে আসছে। তবে নদীতে জাল পেতে রাখা, লাইসেন্সবিহীন, পারমিটবিহীন ও পুরাতন বাতিল করে দেয়া নৌ-যান চলাচলের কারণে কোন কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এ ছাড়া বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙন, বন্যার তীব্রতা, উজানের জোয়ারের পানি, ঘূর্ণি ইত্যাদি কারণে নৌ-দুর্ঘটনার আশংকা বেড়ে যায় (জেলা প্রশাসন, ২০০৪)।

মেঘনার ভাঙন থেকে ধনাগোদা সেচ প্রকল্প রক্ষায় ১০ কোটি টাকার কাজ চলছে

Meghna devouring everything in Chandpur: WDB Master Plan can save CIP, people

মতলবে ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচ হাজার কৃষককে পুনর্বাসন করা হচ্ছে

মতলব (চাঁদপুর) প্রতিনিধি

মতলব দক্ষিণ উপজেলায় চলমান বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ২০ হাজার কৃষকের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৫ হাজার ক্ষুদ্র চাষিকে বীজ, সার ও চারাসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। স্থানীয় কৃষি অফিস জানায়, সরকারি উদ্যোগে এ লক্ষ্যে ৩৫ লাখ টাকার একটি প্রাথমিক প্রকল্প হাতে নেওয়া

বন্যা-পরবর্তী পুনর্বাসন

Current nets worth Tk 11 lakh seized in Chandpur

OUR CORRESPONDENT, CHANDPUR

প্রথম আলোর উদ্যোগে মুক্ত আলোচনা

নদীভাঙন থেকে চাঁদপুরকে রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান

Poultry farming profitable concern

CHANDPUR, Aug. 17

কৃষকদের কাছ থেকে সেচচার্জ নেয়া হবে

মতলবে ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচ হাজার কৃষককে পুনর্বাসন করা হচ্ছে

মতলব (চাঁদপুর) প্রতিনিধি

Drinking water scarcity, bad road condition, load-shedding, sanitation

Chandpur town in grip of multiple problems

চাঁদপুরে নৌটার্মিনাল যাত্রী ছাউনি নির্মাণ কাজে মন্থর গতি

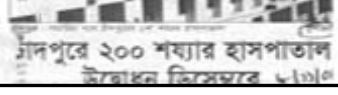

Steps taken to repair roads, drains in Chandpur town

চাঁদপুরে ২০০ শয্যার হাসপাতাল উদ্বোধন ডিসেম্বরে

সম্ভাবনা ও সুযোগ

জেলা ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের গণমানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের (২০০৩) মাধ্যমে জেলার প্রধান সম্ভাবনাময় দিকগুলোর স্পষ্ট ঈঙ্গিত মেলে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও গণউদ্যোগের কয়েকটি সম্ভাবনাময় দিক এখানে আলোচিত হল।

কৃষি ও অর্থনীতি

ইলিশ অভয়াশ্রম : চাঁদপুরের অনন্য সম্পদ মেঘনার ইলিশ । জাটকা নিধন প্রতিরোধ কর্মসূচী ইলিশ সম্পদ টিকিয়ে রাখবে। উল্লেখ্য, চাঁদপুরের ষাটনল হতে হাইমচরের নীলকমল পর্যন্ত ইলিশ অভয়াশ্রম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৬ লাখ টাকা মূল্যের কারেন্ট জাল ধরা হয়। আশার কথা এই যে, অতি সম্প্রতি ইয়ার্ন ব্যবসায়ীরা কারেন্ট জাল বিক্রিতে অসম্মতি জানিয়েছে।

সমন্বিত কীট পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি/Integrated Pest Management (IPM) : জেলার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করতে IPM পদ্ধতি ব্যাপক সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। এর মাধ্যমে একজন কৃষক স্বল্প ও পরিমিত রাসায়নিক সার প্রয়োগের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদনে সক্ষম।

মাছ চাষ : মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ করে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ : চাঁদপুরে মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা গড়ে তোলার সম্ভাবনা অপরিসীম। সারা দেশে মেঘনা-ডাকাতিয়ার মৎস্য সম্পদের সরবরাহ করতে এই মাছ প্রক্রিয়াজতকরণ কারখানা বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

সেচ প্রকল্প : মেঘনা ধনাগোদা সেচ এলাকাকে মেঘনার ভাঙন থেকে রক্ষার তাগিদে সরকার ১২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এর আওতায় দোশানী থেকে এখলাসপুর পর্যন্ত ৬০ কি.মি. দীর্ঘ বাঁধ মেরামত ও পুনঃসংস্কার করা হবে। ভাঙনকবলিত এলাকায় বালুর বস্তার প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। উল্লেখ্য, মতলব উপজেলায় বাস্তবায়িত মেঘনা ধনাগোদা প্রকল্পটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেচ প্রকল্প এবং এর মাধ্যমে উপজেলায় তিন লাখ মানুষ উপকৃত হয়েছে।

শিল্প ও বাণিজ্য : নৌপথে বাণিজ্যে চাঁদপুর জেলা অনেক এগিয়ে আছে। চাঁদপুর জেলায় কৃষিভিত্তিক শিল্প ও বাণিজ্য বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। এতে জেলার অর্থনীতি জোরদার হবে। জেলায় উৎপাদিত পাটের উপর ভিত্তি করে পাটজাত শিল্প কারখানা স্থাপন করা যায়। এ ছাড়া নদীর মাছ সংরক্ষণে মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা গড়ে উঠতে পারে।

কৃষি ও অর্থনীতি
- ইলিশ অভয়াশ্রম
- সমন্বিত কীট পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
- মাছ চাষ
- মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ
- সেচ প্রকল্প
- শিল্প ও বাণিজ্য

প্রাকৃতিক সম্পদ
- মোহনা ও নদীর মাছ

আর্থ-সামাজিক অবস্থা
- স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ
- নদীভিত্তিক প্রকল্প
- শিল্প ও বাণিজ্য
- শিল্প সম্ভাবনা
- ব্যক্তিখাত
- শিল্পাঞ্চল

যোগাযোগ ব্যাবস্থা
- অত্যাধুনিক টার্মিনাল কমপেক্স
- সেতু নির্মাণ
- নৌ-রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- নৌ/নদী বন্দর

পর্যটন শিল্প

প্রাকৃতিক সম্পদ

মোহনা ও নদীর মাছ : মোহনা ও নদী-খালের মাছের সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনা যেমন যথাযথ আইন প্রয়োগ, জেলেদের সুবিধা প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধি ও জলদস্যুদের প্রতিরোধের মাধ্যমে উপকূলে মাছের প্রজাতি রক্ষা ও বাণিজ্যিক আহরণ করা সম্ভব।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা

স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন : চাঁদপুরের জনসাধারণকে উন্নত ও আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার লক্ষ্যে অচিরেই একটি ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। ৫০ শয্যাবিশিষ্ট এ হাসপাতালটি নির্মাণ করা হবে স্থানীয় পর্যায়ে সংগৃহীত তহবিলের মাধ্যমে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত নকশাটি ইতিমধ্যে সংগঠকদের কাছে গৃহীত হয়েছে। জেলার অবস্থাপন্ন ও প্রবাসী জনগণ এক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছেন। এরই মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রায় ২৬ লাখ টাকার অনুদান মিলেছে।

বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ : চাঁদপুরের মতলবে ১২০টি গৃহস্থালি নির্ভর বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি স্থাপন করা হয়েছে। এটি সুপেয় পানির সংকট নিরসনের একটি অস্থায়ী সমাধান। মতলবে ১৬টি Pond Filter System (PFS) স্থাপিত হয়েছে। এর জন্য যে পুকুর প্রয়োজন তা এলাকাবাসীদের উদ্যোগে নির্ধারিত হয় ও এটির সংরক্ষণে তহবিল গঠন করা হয়।

নদীভিত্তিক প্রকল্প : জেলার পানি সংকট নিরসনে নদীর পানি বিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে জনপদে সরবরাহ করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা চাঁদপুর শহরের চারদিকে নদীবেষ্টিত।

শিল্প ও বাণিজ্য

শিল্প সম্ভাবনা : চাঁদপুর দেশের একটি অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র। আর তাই এখানে শিল্প উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে। এটি দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী বন্দর। এই বন্দর দিয়ে ইলিশ, পাট, ধান, তৈলবীজ, সুপারি রপ্তানি করা হয়।

ব্যক্তিখাত : জেলায় গত ২০ বছরে ব্যক্তিখাতের কার্যকলাপ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানিসহ পর্যটন শিল্পে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ জেলার অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়তা করবে।

শিল্পাঞ্চল : প্রতিটি উপজেলায় শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে পারলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে এবং উৎপাদন বাড়বে।

যোগাযোগ ব্যাবস্থা

অত্যাধুনিক টার্মিনাল কমপ্লেক্স : নৌ-পরিবহন ব্যবস্থায় যথাযথ যাত্রীসেবা প্রদানের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে কিছু কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। বড় স্টেশন ৩ নম্বর কয়লা ঘাটে ২০০০ বর্গ ফুট আয়তনের অত্যাধুনিক টার্মিনাল কমপ্লেক্সে ভিআইপি কক্ষসহ যাত্রীদের জন্য নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা থাকবে। এতে দূরপাল্লার যাত্রীদের যাত্রা শুরু করার ক্ষেত্রে ভোগান্তি অনেকখানি কমে যাবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করছেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে এই লঞ্চঘাটে কোন যাত্রী ছাউনি না থাকায় দক্ষিণাঞ্চলগামী যাত্রীদের খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তবে যাত্রী ছাউনিটিতে রেল বিভাগের অধিগ্রহণকৃত জমি ব্যবহৃত হবে বলে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

সেতু নির্মাণ : জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্রীজ বা সেতু নির্মাণ একটি যথোপযুক্ত উদ্যোগ। সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম সংযোজন আব্দুল আউয়াল সেতু এবং ছিকুটিয়া সেতু নির্মাণ এর অন্যতম উদাহরণ।

নৌ-রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন : নদী বন্দরগুলোর উন্নয়ন ও সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপনের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, যাতায়াতের উন্নয়ন ও আঞ্চলিক দূরত্ব কমে গেছে।

নৌ/নদী বন্দর : নদী বন্দর বা ঘাটের সংখ্যা বাড়ানো হলে জেলার উৎপাদিত বা আহরিত কৃষিপণ্য বাজারজাত করার সুবিধা বাড়বে এবং তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ঘুচবে।

পর্যটন শিল্প

জেলার শহর ও গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে। ঐতিহ্যনির্ভর এই স্থানগুলোকে কেন্দ্র করে জেলায় পর্যটন আকর্ষণ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। কেননা জেলা সৃষ্টির শুরু থেকেই এটি নানা শাসক ও রাজ্যের অধীনে থাকার কারণে এর পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাস অত্যন্ত বর্ণময়। আর তাই ঐতিহাসিক স্থান ও পুরাকীর্তিগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্যও অপরিসীম। এ ছাড়া চাঁদপুরের নদী-মোহনাকে কেন্দ্র করে "নৌবিহার"-এর প্রসার ঘটানো যেতে পারে।

ভবিষ্যতের রূপরেখা

বর্তমান জনসংখ্যা ২২ লাখ ৪১ হাজার থেকে ২০১৫ সালে হবে ২৫ লাখ ৫৪ হাজার এবং ২০৫০ সালে ৩৩ লাখ ৮১ হাজার । মাত্র ১৫ বছরে লোক সংখ্যা বাড়বে ৩ লাখ ১৩ হাজার । ২০১৫ সালে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের শেষ বছর। জেলার জনসংখ্যার ৪৯.৬২% পুরুষ এবং ৫০.৩৭% নারী আর ৮৬% গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ও ১৪% শহুরে জনগোষ্ঠী।

এই বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য এবং জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের নানান পথ তৈরি করতে হবে। জেলার উন্নয়নে যে সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যায় তা হল কৃষি, মাছ উৎপাদন, চিংড়ি উৎপাদন, পর্যটন সম্ভাবনা ইত্যাদি। অন্যদিকে নদীভাঙন, আর্সেনিক দূষণ, বাঁধ ও অন্যান্য অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ জলাশয় ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিশেষ মনযোগ দেয়া যায়।

চাঁদপুর জেলাকে মেঘনার ভয়াবহ ভাঙন থেকে রক্ষায় যথাযথ সমীক্ষা, উপযুক্ত প্রযুক্তি ও কৌশল, গণমানুষের ঐকান্তিক সহযোগিতা কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়। ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রতিটি সমস্যার আঞ্চলিক ও স্থানীয় কারণ অনুসন্ধান, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ আশাবাদী ভূমিকা রাখবে।

চাঁদপুরের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরাপদ পানি সুবিধা নিশ্চিত করতে স্বল্প মূল্যের আর্সেনিক প্রতিরোধ কৌশল, নদীভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, স্বল্প সুদে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ও দুর্গত এলাকায় পাইপ লাইনে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, সরকারি বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ সহায়ক হবে।

কৃষকদের কৃষি ঋণ, কৃষি উপকরণ, কৃষি প্রশিক্ষণ, সমন্বিত ধান মাছ চাষ পদ্ধতির প্রসার, নারী-পুরুষদের IPM পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ, কৃষিপণ্য বাজারজাত ও গুদামজাতকরণ নিশ্চিত করাসহ চরাঞ্চলে ও জেলার প্রত্যন্ত জনপদের জলাবদ্ধতা দূর করে এক ফসলী জমিগুলোকে দুই বা তিন ফসলী জমিতে রূপান্তরের মাধ্যমে জেলার কৃষিনির্ভর অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে।

চাঁদপুরের অনন্য সম্পদ মেঘনার ইলিশ। এই ইলিশের প্রাচুর্য্য ধরে রাখতে মেঘনায় জাটকা নিধন, কারেন্ট জালের যথেচ্ছ ব্যবহার ও নদী দূষণ প্রতিরোধ করতে পারলে জেলেদের জালে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ধরা পড়বে ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ইলিশের সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং জেলেদের আর্থিক উন্নয়ন ঘটবে।

ক্ষুদ্র শিল্প কল কারখানার পাশাপাশি ভারী শিল্প কারখানা স্থাপন করতে পারলে নদী বন্দরভিত্তিক বাণিজ্য সম্ভাবনা বিকাশের পথগুলো নিশ্চিত করা যাবে। এ ছাড়া জেলার ৮টি উপজেলায় ৮টি শিল্পাঞ্চল করা যেতে পারে। শিল্পাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানায় জেলায় প্রাপ্ত কাঁচামাল যেমন মাছ, কাঠ, অন্যান্য সামুদ্রিক কাঁচামাল, কৃষিপণ্য ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে, রাস্তা-ঘাট, বন্দর, বিদ্যুৎ, যোগাযোগসহ নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। সব ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা নিশ্চিত করে উপজেলার প্রবাসী ব্যক্তিবর্গকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা সম্ভব। উপজেলার প্রবাসী বাংলাদেশীগণ একদিকে যেমন বিনিয়োগ করতে পারবে অন্যদিকে প্রবাসে থাকার কারণে রপ্তানিতে ভূমিকা রাখতে পারবে। বস্তুত, সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে এই উদ্যোগ চাঁদপুরের অর্থনীতিতে বিরাট সাফল্য নিয়ে আসবে।

দর্শনীয় স্থান

চাঁদপুর জেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে। তবে দর্শনীয় স্থানের সংখ্যা খুবই নগন্য। যেটুকু প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ এখনো রয়েছে তা যথাযথ সংরক্ষণ, পরিচর্যা আর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার অভাবে ধবংসাবশেষ হিসেবে টিকে আছে। ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির এই নিদর্শনগুলোকে ঘিরে পর্যটনের বিকাশ বা দর্শনীয় স্থানে পরিণত উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এই নিদর্শনগুলো আজ প্রাকৃতিক ও মানুষের কারণে ব্যাপক হুমকির সম্মুখীন। যথাযথ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে এইসব প্রাচীন শিল্প ও স্থাপত্যের পর্যটন মূল্য বাড়ানো সম্ভব। উল্লেখ্য চাঁদপুর জেলায় নৌ পর্যটন ও নৌবিহারের সম্ভাবনা অপরিসীম।

মিহির : হাজীগঞ্জ উপজেলার একটি গ্রাম মিহির বা নিজ মিহির। প্রতিবছর এ গ্রামে পৌষ সংক্রান্তির মেলা বসে। এতে বহু লোকের সমাগম হয়।

চাঁদপুর সদর উপজেলা : চাঁদপুর সদর উপজেলায় উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত কয়েকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ধ্বংশাবশেষ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মঠখোলার মঠ, বেগম মসজিদ (১৮১২) ও কালিবাড়ী মন্দির (১৮৭৮) ইত্যাদি। সংরক্ষণ ও মূল্যায়নের অভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের উদ্যোগে নির্মিত এই সব নিদর্শন আজ বিলীন হতে শুরু করেছে। এ ছাড়াও আছে বড় মসজিদ, বাকিলার মঠ এবং বলখলের হরিসাহার বসতবাড়ি।

কচুয়া : কচুয়া উপজেলার বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন বখতিয়ার খাঁ জামে মসজিদ। সেই সাথে পালগিরি গ্রামের জামে মসজিদ, বেহুলার দীঘি ও পাটা, মনসা দেবীর মানস মুরা এবং তুলাতুলির মঠ উল্লেখযোগ্য।

ফরিদগঞ্জ : ফরিদগঞ্জে একসময় নীলকরেরা নীল ব্যবসা শুরু করেন। সাহেবগঞ্জের নীল কুঠিটি তারই ইতিহাস বহন করে। এ ছাড়া লোহগাড়ার মঠটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

মতলব : মতলব উপজেলায়ও রয়েছে নীলকর ও রাজ-রাজাদের নিদর্শন। মুনসিদি'র নীলকুঠি, লধুয়া'র জমিদারের বসতবাড়ি এবং কাশিমপুরের বড়দুয়ারার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

জেলায় বিভিন্ন মৌসুমে নানা ধরনের মেলা বসে। চাঁদপুরের অষ্টমী স্নান মেলা, শাহরাস্তির মেহের কালি মেলা, পৌষ সংক্রান্তির মেলা, বিজয় মেলা, আলীগঞ্জ এবং হাজীগঞ্জের অষ্টমী মেলা, মতলবের বেলতলী মেলা এবং বই মেলা অন্যতম।